অনুতপ্ত

– মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান

আমি এসএসসি ফেল অর্থাৎ গণ্ড মূর্খের একটু উপরের পর্যায়ের যাকে বলে মূর্খ। ফেল করার পর কাঠমিস্ত্রির কাজে লেগে যাই ১৯৯০ সালে। এর প্রায় পাচ বছর পর শুরু হয় আমার জীবনের অবিস্মরণীয় প্রেমকাহিনী। অবশ্য সেটা শুধু আমার কাছে অবিস্মরণীয়।

তখন আমি একটা ফার্নিচারের দোকানে কাজ করতাম। আমাকে প্রতিদিন দোকানে যেতে হতো সকাল নয়টায়। প্রতিদিনের মতো একদিন গিয়ে দেখি তখনো দোকান খোলা হয়নি। হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সাড়ে আটটা বাজে। বাড়িতে ভুল করে ঘড়ি দেখার কারণে এ ঘটনা ঘটলো। এছাড়া প্রতিদিন ঠিক নটায় দোকানে যেতাম।

যাহোক, এরপর একটি বেঞ্চে বসে পরলাম মালিকের অপেক্ষায়। এমন সময় একটি মেয়ে আমার সামনে দিয়ে হেটে যাচ্ছিল। তার কানায় কানায় ভরা যৌবন আর অপূর্ব চেহারা আমাকে মুগ্ধ করলো। একটা লোভ আর অজানা ভীতি আমাকে গ্রাস করলো।

যুবতীর পোশাক–পরিচ্ছদ দেখে খুব একটা ধনী ঘরের মেয়ে বলে মনে হলো না। আমি গরিবের ছেলে বলে ধনীর দুলালিদের দিকে ভুলেও তাকাতাম না।

এরপর প্রতিদিন দোকানে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই যেতাম। মেয়েটিও ওই সময়েই যেতো।

আমি তাকে নিয়ে অনেক আকাশ কুসুম ভাবলাম। মনে মনে তাকে ভালোবেসে ফেললাম।

কিছুদিন পর ভালোলাগা মেয়েটির কথা আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে বললাম। আমরা দুই বন্ধু তার সম্পর্কে খোজ নিলাম। জানা গেল মেয়েটির নাম রাখী, জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজের বিএ ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী এবং তার বাবা বড় রকমের চাকরি করেন।

আমার মনে হলো, *কোথায় শেখ সাদি আর কোথায় ছাগলের লাদি।*

একদিন প্রচণ্ড সাহসসহ অন্যর শেখানো বুলি নিয়ে তার সামনে হাজির হলাম এবং সুইচ অন করলাম। রাখী আমি তোমাকে লাইক করি, তোমাকে ভালোবাসি ইত্যাদি।

সে আমাকে বললো, আমার ভালোবাসার কথা আপনাকে আগামীকাল আমি জানাবো। OK.

তারপর থেকে ঘণ্টা বিশেক মহা আনন্দেই ছিলাম।

পরদিন বিকেলে আমাদের ওয়ার্ড মেম্বারের কাছে যাওয়ার নোটিশ এলো।

তার কাছে আমি যেতেই একটা আস্ত লাঠি আমার পিঠে ভাঙা হলো, পাশে পড়ে থাকা ভাঙা চেয়ারের পা দিয়ে আমার ডান পায়ে আঘাত করলে পা ভেঙে পায়ের হাড় বের হয়ে আসে।

এরপরও তিনি বললেন, হারামজাদা, আর যদি কোনোদিন রাখীকে ডিস্টার্ব করিস তাহলে তোর হাড্ডি–মাংস এক জায়গায় করবো।

আমার খুব কান্না পেল। কিন্তু কাদতে পারলাম না। ভাবলাম, আমাকে সে বলতে পারতো, তোমাকে আমি পছন্দ করি না বা আমার সঙ্গে প্রেম করার যোগ্যতা তোমার নেই। আমার খুব রাগ হলো। ভাবলাম তার অহংকার আমি চূর্ণ করবো।

আমার পা পুরোপুরি ভালো হতে তিন মাস সময় লাগলো। এই তিন মাস কোনো কাজ করতে না পারায় আমাদের সংসারের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল। আমার রাগ ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগলো।

এসিড সংগ্রহ করে রাখলাম প্রায় পাচশ মিলি এবং সব সময়–সুযোগ খুজতাম। একদিন পেয়ে গেলাম। সেদিন রাখী ও তার মা সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরছিল। বর্ষার দিন হওয়ায় রাস্তায় লোকজন ছিল না বললেই চলে। আমি

পেছন থেকে দৌড়ে সামনে গিয়ে এসিড ছুড়লাম রাখীর মুখে। সে চিৎকার করে উঠতেই কয়েকজন দৌড়ে এলো তার কাছে। আমি ততোক্ষণে গা ঢাকা দিয়েছি। কিন্তু রাখীর মা আমাকে চিনে ফেলেছিলেন।

এর সাজা হিসেবে জেল খেটেছি তিন বছর।

জেল থেকে বের হয়ে রাখীর ঝলসানো চেহারা একবার দেখেছিলাম। রাখী বর্তমান ঢাকায় বসবাস করছে। তার ঠিকানা জানি না। এখন আমার সব সময় মনে হয়, খুব বড় ধরনের অপরাধ করে ফেলেছি। রাখীর কথা মনে হলে আমার ভীষণ কান্না পায়। যখনই তার ঝলসানো চেহারা আমার মনে ভেসে ওঠে তখনই আমার বিবেক আমাকে ক্ষমা করতে পারে না।

জানি না এ লেখা রাখীর কাছে পৌছাবে কি না। যদি পৌছে তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দিও রাখী, যদিও আমি ক্ষমার অযোগ্য।

দাদরা, জয়পুরহাট থেকে

বন্ধু

– নূপুর

সময়টা ছিল নভেম্বর মাস। সারা দিন বাসায় একা একা বসে থাকা বোরিং লাগে। সেদিন বিকেলে ছাদে হাটছি। হঠাৎ মনে হলো কে যেন আমাকে অনুসরণ করছে। তাকিয়ে দেখলাম, আমাদের বাসা থেকে কয়েক হাত দূরে একটি বাড়ির জানালা থেকে একটি ছেলে আমাদের ছাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

তার পরনে ছিল একটি টকটকে লাল টি শার্ট। তাই সহজেই চোখে পড়েছিল। দেখেও না দেখার ভান করে নেমে পড়লাম। যেহেতু সময়টা ছিল শীতকাল, তাই সারা দিনে কয়েকবার ছাদে যাওয়া হতো।

পরের দিন কৌতূহলবশত ছাদে উঠে সেদিকে তাকালাম। দেখলাম ছেলেটি ঠিক একই স্থানে, একই কাপড়, একই ভঙ্গিতে দাড়িয়ে আছে।

এরপর যতোবারই উঠি ততোবারই সে নানানভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছিল। সে ইশারাতে কথা বলতো, কিছু বুঝতাম, কিছু বুঝতাম না।

সে প্রশ্রয় পায় এই ধরনের কোনো ব্যবহার করতাম না। এমনকি ছাদে উঠে সরাসরি ওদিকে তাকাতাম না। আড়চোখে দেখতাম তবুও সে কিভাবে যেন বুঝতে পারতো তাকে দেখছি।

সে অমনি ইশারা শুরু করতো। আমি যতোবারই ছাদে উঠতাম সে নানান ভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করতো।

দিন দিন আমার কৌতূহল বাড়তে থাকলো। কে এই ছেলে? কেনই বা এমন করে? মাঝে মধ্যে ইচ্ছা হতো তাদের বাসায় গিয়ে নালিশ করি। আবার ভাবতাম, বেচারা হয়তো পাগল–টাগল হবে। নাহলে আমার মতো শ্যামবর্ণা, বাংলা পাচ মার্কা চেহারা, বিবাহিতা ও বাচ্চার মায়ের সঙ্গে কেন এমন করে?

এভাবে প্রতিদিন ছাদে উঠলে আমার চোখ শুধু তাকে খোজে। কখনো দেখি রাস্তায়, কখনো দোকানের সামনে, কখনো জানালায়, কখনো বারান্দায়। সারাক্ষণ তার চোখগুলো থাকতো আমাদের ছাদের দিকে।

পরে কেন জানি তার ওপর মায়া পড়ে গেল। মাঝে মধ্যে তাকে চড়–থাপ্পড় দেখাতাম। সে কিছুক্ষণ অভিমান করে থাকতো। পরে আবার দুষ্টুমি করতো। ইশারায় বলতো তাকে চিঠি দিতে, তার সঙ্গে বেড়াতে যেতে। অনেক সময় হার্ট দেখাতো আমার দিকে ইশারা করে।

একদিন বান্ধবীর বাসায় যাচ্ছিলাম। দেখলাম রাস্তায় সে দাড়িয়ে আছে। কেন জানি মনে হলো সে আমার পেছন পেছন আসছে। রিকশা থেকে নেমে তাকে দেখতে পেলাম না। বান্ধবীর বাসায় গিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করলাম।

ওখান থেকে বের হয়ে দেখি সে রাস্তায় একটি গাছের নিচে দাড়িয়ে আছে। সে বললো, আমাকে দেখেও কেন তুমি ও বাড়িতে ঢুকে পড়লে?

বললাম, আমি তোমাকে দেখিনি।

তারপর সে আমার বাচ্চার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, এটা কি তোমার বাচ্চা?

হ্যা।

আমরা রাস্তার পাশ দিয়ে হাটছিলাম।

সে বললো, কোথায় যাবে?

জানি না।

ফয়েস লেকে যাবে?

আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়ালাম।

সে একটা রিকশা ডেকে আমাকে উঠতে বললো।

আমি কনজারভেটিভ ফ্যামিলির মেয়ে। কখনো বাবা, ভাই, স্বামী ছাড়া বাইরের কোনো পুরুষের সঙ্গে এক রিকশায় বসিনি। তাই সংকোচ লাগছিল। আমি আরেকটা রিকশায় উঠলাম। দুজনে দুই রিকশায়।

সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে অনেক কথা হলো। সে বললো, চাইলে আমরা বন্ধু হতে পারি।

মনে মনে খুশিই হলাম। কারণ, বাসায় সারা দিন একা একা বসে থাকা ভালোলাগে না, সময় কাটতে চায় না।

সে বললো, তোমাদের বাসা আমাদের পাশে হওয়াতে যেতে পারি না। তুমি অন্য কোথাও বাসা নিলে সেখানে বেড়াতে যাবো তোমার সঙ্গে গল্প করবো।

বললাম, আমার স্বামী খুব রাগ করবে। কারণ, সেও আমার বাবার মতো কারো সঙ্গে কথা বলা পছন্দ করে না। এমনকি আমার কাজিনদের সঙ্গে আমি কথা বলি সেটাও চায় না।

সে বললো, তাহলে তো তোমার স্বামীর ঈর্ষা হওয়ার জন্য তোমার বাসায় আরো বেশি বেশি যাওয়া উচিত।

বললাম, আমার সারা দিন বাসায় একা একা ভালোলাগে না। মাঝে মধ্যে মাথায় কেমন সব উদ্ভট চিন্তা–ভাবনা আসে। এই যে এখন তোমার সঙ্গে এখানে চলে আসা, এটাও পাগলামি নয় কি? আমার মনে হয় একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো প্রয়োজন।

সে বললো, ডাক্তার লাগবে কেন? আমিই তো আছি!

যাওয়ার সময় সে বললো, এক রিকশায় আসোনি। কিন্তু এক ট্যাকসিতে যেতে তো সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

না করতে পারলাম না। ট্যাকসির এক কোণায় জড়োসড়ো হয়ে বসে পড়লাম। মাঝখানে বাচ্চা, তারপর সে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিলাম।

হঠাৎ অনুভব করলাম সে আমার মুখে ফু দিচ্ছে।

তাকিয়ে দেখলাম সে হাসছে।

বললো, আবার কখন আসবে?

বললাম, তুমি এ ধরনের আচরণ না করলে আসতে পারি।

সরি, আর কখনো করবো না। তারপর মোড় আসতেই সে বললো, বাসার কাছেই চলে এসেছি। আমি এখানে নেমে যাই।

বললাম, আচ্ছা। আল্লাহ হাফেজ।

সে একটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো ওভাবে নয়, এভাবে বিদায় জানাতে হয়।

হঠাৎ আমার বুকটা ধক করে উঠলো। কি চায় সে আমার কাছে? কেন এ ধরনের আচরণ করছে।

বললাম, আমি এভাবে বিদায় দিতে পারবো না। আল্লাহ্ হাফেজ।

তারপর আবার সেই ছাদ, আগের মতো ইশারায় কথা বলা। সামনে ঈদ। তাকে কিছু একটা দিতে ইচ্ছা করছে। তাই একটি কার্ড আর শোপিস নিলাম। কিন্তু এগুলো দিই কিভাবে?

একদিন সে ইশারায় বেড়াতে যাবার কথা বললো।

ভাবলাম, যাই কার্ডটা দিয়ে আসি।

আবার সেই ফয়েস লেক।

তাকে জিনিসগুলো দিলাম।

এবার সে কিছুটা চুপচাপ। কম কথা বলেছিল। কেন এই পরিবর্তন বুঝতে পারলাম না।

সে বললো, কয়েক দিনের মধ্যে মোবাইল নেবো। তারপর তোমাকে নাম্বার জানালে যোগাযোগ করো।

আমিও আমার নাম্বারটা দিয়ে বললাম, এই নাম্বারে ফোন করো।

তারপর আবার একই ট্যাকসিতে বাসায় ফিরলাম।

সে চুপচাপ বসেছিল। মোড় আসতেই আমার বাচ্চাকে একটি ভার্জিন কিনে দিয়ে চলে গেল।

কয়েকদিন কেটে গেল।

একদিন আমি আর আমার স্বামী ছাদে বসেছিলাম।

সে একটি ছোট ছেলের সঙ্গে বারান্দায় কৃকেট খেলছিল। সে হাসছিল। বলটা আমার দিকে ছুড়ে দেয়ার ভঙ্গি করছিল।

আমার স্বামী অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল। তাই দেখতে পায়নি।

ছাদে আরো কিছুক্ষণ থাকার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পাছে আমার স্বামীর চোখ এদিকে পড়ে তাই নেমে গেলাম।

সেদিনই ছিল তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। এরপর তাকে আর সে বাড়িতে দেখিনি।

এখনো শত কাজের মাঝেও সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। সেই ফয়েস লেকের বেঞ্চ, চাদের সেই মুহূর্তগুলো আমার স্মৃতির পাতায় চিরঅম্লান হয়ে থাকবে। ঈদের পর তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলাম।

কিন্তু সে আমাকে ভীষণভাবে অপমান করেছে।

আমার স্কুল কলেজ জীবনে কোনো বন্ধু বা বান্ধবী নেই। তাই শুধু বন্ধুত্বের উদ্দেশ্যে তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম। খারাপ উদ্দেশ্যে নয়। অথচ সে আমাকে খারাপ মেয়ে বলে অপবাদ দিয়েছে। যদি এই লেখা তার চোখে পড়ে তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে আমি কে?

আমি তোমাকে কখনো শয্যাসঙ্গী হিসেবে চাইনি। চেয়েছিলাম একজন বন্ধু হিসেবে। শয্যাসঙ্গী হিসেবে তো আমার স্বামী একাই একশ। তোমার মতো কাপুরুষের কি প্রয়োজন? তবুও তোমায় ধন্যবাদ তোমার সঙ্গে কাটানো সেই মুহূর্তগুলোর জন্য। কেন জানি তোমাকে ঘৃণা করতে চাইলেও পারি না।

কুমিল্লা থেকে

নিরুত্তর সাগর

– আনিসুর রহমান

১৪ ফেব্রুয়ারি সারা পৃথিবী জুড়ে যখন ভালোবাসার জোয়ার তখন আমার হৃদয়ে কষ্টের জলোচ্ছ্বাস। তখন কক্সবাজারের বিস্তীর্ণ বালুকাবেলায় বসে এক প্রবল জলোচ্ছ্বাসের প্রত্যাশা করি যা আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তোমার চোখের মতো গভীর নীল সমুদ্রে।

যে আমি কি না কলেজ জীবনে ছিলাম চিরকুমার সভার সভাপতি, নারী বিদ্বেষী গ্রুপের প্রধান, যার কথার যন্ত্রণায় প্রেমিক বন্ধুরা অস্থির হয়ে যেতো সেই আমিই কি না মেডিকালের কোচিং সেন্টারের চৌকাঠে হোচট খেয়েছিলাম তোমার গভীর নীল চোখ দুটো দেখে। সম্ভবত তুমিই সবচেয়ে বেশি হাসাহাসি করেছিলে ব্যাপারটি নিয়ে। প্রতিশোধ নেয়ার মজ্জাগত স্বভাবের কারণে কিংবা তোমার গভীর নীল চোখ দুটোর টানেই হয়তো তোমার সঙ্গে আমার প্রথমে কাদা ছোড়াছুড়ি এবং পরিশেষে খানিকটা সখ্যতা গড়ে ওঠে। তাই হয়তো বা ভর্তি পরীক্ষার প্রচণ্ড চাপের মাঝেও খানিকটা ভালোলাগা, বন্ধুত্বের দরজায় কড়া নেড়েছিল। তখনো আমার জানা ছিল না তোমার পূর্ব পুরুষরা ছিল নীল চোখের পর্টুগিজ বংশোদ্ভূত যারা অনেক বছর আগে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আস্তানা গেড়েছিল চট্টলার ছোট সমুদ্রবন্দরে।

যদিও ঢাকার বাইরে পড়াশোনা করার ইচ্ছা একদম ছিল না তবুও ডাক্তারি যেহেতু পড়তেই হবে কিংবা হয়তো নিয়তির অমোঘ টানেই সিলেট মেডিকালে পড়তে আসা। প্রথম দিন লেকচার ক্লাসে ঢুকেই দেখলাম সেই অপূর্ব দুটো চোখ এবং দরজায় কোণায় পা লেগে হুড়মুড় করে পড়ে গেলাম।

কি হাসিটাই না তুমি হেসেছিলে।

কেউ বললো, আহা বেচারা! অন্ধ হয়েও ডাক্তারি পড়তে এসেছে।

কেউ বললো, এই ব্যাটা নিশ্চয়ই দুপায়ে ব্যালান্স রাখতে পারে না, আরেকটা পা দরকার।

আরেকজন দূর থেকে টিপ্পনি কাটলো, দোস্ত, আমার মামার চশমার দোকান আছে, দেবো নাকি একটা?

কেউ কি জানতো, নীল চোখের অন্ধকারে আমি হারিয়ে গেছি, চোখ থাকতেও অন্ধ হয়ে গেছি? বোধহয় তুমিই প্রথম জেনেছিলে। তাই তো মনের অজান্তে তুমিই হয়েছিলে মনের মানুষ।

আমরা ছিলাম যতোটুকু না বন্ধু তারচেয়েও বেশি সহযোগী। মেডিকালের দুর্বোধ্য পাঠ্যর বাইরেও আমরা আলোচনা করতাম সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি এবং অর্থনীতির নানান দিক, ইতিহাসের উত্থান-পতন। আমাদের গল্পের কোনো শেষ ছিল না, শেষ হওয়ার কথাও ছিল না।

মাঝে মধ্যে ইমোশনাল হয়ে তুমি বলতে, এই, তুমি কি সন্ন্যাসী না কি? আমাকে ছুতেও তোমার এতো বাধে!

আমি বলতাম, থাক না ব্যাপারটা স্বর্গীয়, পবিত্রতার বাতাসে বিশুদ্ধ।

তুমি তখন রেগে গিয়ে বলতে, ঠিক আছে, তুমি স্বর্গে গিয়েই আমাকে ছুয়ো।

সামনে আমাদের তৃতীয় ভ্যালেনটাইনস ডে। দুজনে কতো পরিকল্পনা করেছি, কতো স্বপ্ন দেখেছি। এবারে আমাদের উদযাপন হবে সেরা উদযাপন।

হঠাৎ সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেল। রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হলো। তুমি চট্টগ্রাম বাসায় চলে গেলে তাড়াহুড়া করে। যাবার আগে মুখের ভাষায় বলে গেলে, এবার হ্যাপি ভ্যালেনটাইনস ডে যেন তোমাদের বাসায় উদযাপন করি, চোখের জলে বুঝিয়ে গেলে না, আসলে আমার বারোটা বাজাবে।

বাসায় গিয়ে তুমি লিখলে তোমার জীবনের শেষ চিঠি।

রাজু

...সবাই মিলে ঠিক করেছি ভ্যালেনটাইনস ডে কাটাবো সি-বিচে, কক্সবাজারে, সঙ্গে আমার কাজিনরা থাকবে। তুমি না এলে আমি খুব একা ফিল করবো। ভীষণ একা...।

ইতি -

তোমারই নীলপরী

দুর্ভাগ্যবশত আমি যখন বিচে পৌছালাম তখন বিকেল হয়ে গেছে। তারপর শুনলাম সেই হৃদয় ছিড়ে নেয়া খবর। নীল সাগরের অথৈ জলে হারিয়ে গেছে আমার নীলপরীদের রানী। কিন্তু এ যে অসম্ভব! ছুটে গেলাম সাগর পানে। যে করেই হোক তাকে ছিনিয়ে আনবো। কোস্ট গার্ডরা সেদিন না ফেরালেই বোধহয় ভালো ছিল।

প্রতি বছর ভ্যালেনটাইনস ডে এলেই ছুটে যাই কক্সবাজার। শাদা বালির মাঝে হাটু গেড়ে বসে নীল সাগরের দিকে তাকালেই প্রিয়ার মুখচ্ছবি দেখতে পাই। সাগরকে শুধাই, তোমার এতো নীল, তবু আমার প্রিয়তমার নীল চোখ দুটোর তোমার কি প্রয়োজন ছিল?

সাগর নিরুত্তর থাকে। বিশাল নীলের পাহাড়গুলো আছড়ে পড়ে তীরে। লাখ লাখ বিন্দুতে বিভক্ত হয়ে ছুটে আসে আমার দিকে।

সিলেট থেকে

শূন্যতা

– মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান

এসএসসি পাস করে ১৯৯১ সালে ভর্তি হলাম চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে। কলেজে প্রথম দিন ঢুকেই অন্য এক রকম ভয়, লজ্জা অনুভব করলাম। কারণ এর আগে কোনোদিন এতো ছেলেমেয়ের এক সঙ্গে মিলন মেলার মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করিনি। ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পর যখন নিজের মুখমণ্ডলের অবাঞ্ছিত দাড়ি–গোফ শেভ করি তখন নিজেকে বেশ বড় বড় মনে হতো।

কলেজে প্রথম দিনের ক্লাসটি ছিল আমার জন্য এক অন্য রকম অনুভূতি এবং ভিন্ন অভিজ্ঞতা। কারণ, এর আগে কোনোদিন এতো মেয়ের সঙ্গে ক্লাস করার কথা ভাবিনি। যাহোক, ক্লাসটি ছিল মূলত পরিচিতিমূলক। কিন্তু এ পরিচিতি ক্লাসেই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাটি ঘটলো। ক্লাস চলাকালে ঠিক মাঝ পথে, আসতে পারি স্যার, মিষ্টি কণ্ঠটি শোনা মাত্রই সবার দৃষ্টি আটকে গেল দরজার দিকে। সবাই যেন হা হয়ে গেল, আমি তো অবশ্যই।

স্যার বললেন এসো।

পরে জানলাম তার নাম ঝরা। সে ছিল মন খারাপ করে দেয়ার মতো সুন্দরী। কারণ, কিছু কিছু সুন্দর আছে দেখলেই মন খারাপ হয়ে যায়। হয়তো বা না পাওয়ার আক্ষেপে। পুরো কলেজেই সে হয়ে গেল টক অফ দি কলেজ। ঘুরে ফিরে শুধু ওই একটি নামই শুনতাম বন্ধুদের মুখে। সে যে সব ছেলের ঘুম হারাম করে দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

বন্ধুরা দেখতাম, নানান অজুহাতে তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করছে। আমার অবশ্য এই ধরনের যেচে পড়ে ছ্যাবলামো মোটেই পছন্দ হতো না। হোক না সে আমার ঘুম হারামকারিণী। অনেক ছেলের মুখে শুনতাম সে নাকি কলেজে না এলে তাদের কলেজে আসাই বৃথা।

ভেতরে ভেতরে আমি যে অনবরত দগ্ধ হচ্ছি তা কাউকে বুঝতে দিইনি। মনে মনে আমিও সুযোগ খুজি কিভাবে তার সঙ্গে পরিচয় হওয়া যায়।

আমার এক শিক্ষক বলতেন, কোনো মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক করতে হলে আগে তার সঙ্গে যে কোনো উপায়ে ঝগড়া বাধিয়ে ফেল। হয় তার গায়ে অসাবধানতাবশত চা ফেলে দাও অথবা কলমের কালি লাগিয়ে দাও কিংবা ধাক্কা দিয়ে বই খাতা ফেলে দাও। দেখবে, সে তোমাকে গালিগালাজ করছে। তোমার নাম জানতে চাচ্ছে। তোমার বাড়ি কোথায় ইত্যাদি জানতে চাচ্ছে। তুমিও তার কাছে বার বার ক্ষমা চাইতে থাকো এবং বলো যে, ভুল হয়ে গেছে। এক পর্যায়ে দেখবে, তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।

এই থিওরিটি আমার মনে গেথে গিয়েছিল এবং এটাই তার ওপর প্রয়োগ করার সুযোগ খুজছিলাম। আবার পিছিয়ে আসি যদি সে বন্ধুত্ব না করে সবার সামনে একটা বড় ধরনের অপমান করে বসে এই ভয়ে।

ঘটনাটি ঘটলো ইংরেজি স্যারের ক্লাসে। আমি বসেছি সবার পেছনের বেঞ্চের আগের বেঞ্চে। আর সে বসেছে ঠিক আমার সামনের বেঞ্চে। আমি তার ফর্শা পিঠটা দেখছিলাম কিভাবে খোলা চুলগুলোর ফাক দিয়ে উকি দিচ্ছে ঠিক যেভাবে মেঘের ফাক দিয়ে চাদ উকি দেয়। হঠাৎই মাথার মধ্যে বুদ্ধিটা খেলে গেল। এই তো সুযোগ, সন্তর্পণে তার পিঠের উপর পড়ে থাকা কয়েকটি খোলা চুল নিয়ে পেছনের হেলানের সঙ্গে বেধে দিলাম। ক্লাস সে কোন দিক দিয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে তা টের পাইনি। যেই না স্যার উঠে বাইরে যেতে উদ্যত হয়েছেন সব ছাত্রছাত্রী উঠে দাড়াতে যাবে তখনই একটা ভয়ংকর আর্তনাদ *ও মাগো* বলে কাউকে চেচিয়ে উঠতে শুনলাম। সবার দৃষ্টি তখন পেছনের দিকে। এমনকি স্যারও চিৎকার শুনে ফিরে এসেছেন। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে গেলাম।

স্যার পেছনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে?

তখনো তার চুল বাধা পেছনে। তাকে কিছু বলতে শুনলাম না, শুধু কাদতে দেখলাম।

যেহেতু তার পেছনে ছিলাম, স্বাভাবিকভাবেই সবার সন্দেহ আমার ওপর পড়লো।

আমাকে সবার সামনে ডেকে স্যার চিৎকার করে বললেন, এই ছেলে, তোমার নাম কি? এই মুহূর্ত থেকে তুমি কলেজ থেকে বেরিয়ে যাও এবং তোমাকে যেন আর কোনোদিন এই কলেজের ত্রিসীমানায় না দেখি।

মাথা নিচু করে ক্লাস থেকে বেরিয়ে সোজা কলেজের বাইরে চলে এলাম।

কলেজ থেকে বেরিয়ে আসার পর মাথার মধ্যে একটা হালকা ভাব অনুভব করলাম। মনে হচ্ছিল অনেক দিনের জমে থাকা একটা বোঝা মাথা থেকে নেমে গেল। কলেজ থেকে সোজা বাড়ি চলে এলাম।

মা বললেন, কি রে, এতো তাড়াতাড়ি চলে এলি?

বললাম, ক্লাস হলো না, তাই চলে এলাম।

এরপর দোতলায় উঠে রুম আটকিয়ে শুয়ে থাকলাম। বাইরে থেকে ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙলো।

মা কপালে হাত দিয়ে বললেন, শরীর খারাপ নাকি? এই অসময়ে শুয়ে আছিস।

বললাম, গতকাল রাত জেগেছি তো, তাই ক্লান্ত লাগছিল।

বিকেলে দুই বন্ধু বাসায় এলো। তাদের কাছে শুনলাম ঝরা নয়, আমিই নাকি এখন টক অফ দি কলেজ।

নিজেকে বেশ হিরো হিরো মনে হচ্ছিল।

পরের দিন কলেজে গেলাম। কিন্তু ক্লাসে ঢুকলাম না। লক্ষ্য করলাম নানান উৎসুক চোখ আমাকে লক্ষ্য করছে আর কানাঘুষা করছে। দোতলায় উঠে করিডোরের এক কোণায় দাড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম বিরতির জন্য। ক্লাস শেষে ঝরাকে দেখলাম আসতে। তাকে কেমন যেন বিমর্ষ মনে হচ্ছিল। স্যার চলে যেতেই তার পেছনে গিয়ে বললাম, ঝরা শোনো।

সে দাড়িয়ে পড়লো।

হাত দুটো জোড় করে বললাম, প্লিজ, ক্ষমা করে দাও, আমি আসলে বুঝতে পারিনি ঘটনাটি এতো সিরিয়াস হয়ে যাবে। আমি কি তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?

কি বলবে বলো।

আমি তো ভেতরে ভেতরে খুবই অবাক হয়ে যাচ্ছি তার সুন্দর ব্যবহারে। তাকে আবারও ওই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলাম। বললাম, আসলে বুঝতে পারিনি যে, তুমি সঙ্গে সঙ্গে দাড়িয়ে পড়বে। বিশ্বাস করো, তোমাকে ব্যথা দেয়ার জন্য এমনটি করিনি। বললাম – প্লিজ, স্যারকে গিয়ে তুমি বলো যে, আমাকে ক্ষমা করে দিতে। না হলে বাবার কানে গেলে আমার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যাবে।

সে বললো, তোমার তো শাস্তি হয়ে গিয়েছে। সবার সামনে তোমাকে স্যার যেভাবে অপমান করে বের করে দিল সেটাই তো যথেষ্ট।

তারপর তার সঙ্গে স্যারের চেম্বারে গেলাম। সে বললো, আমার যাওয়া ঠিক হবে না। আমি বাইরে অপেক্ষা করছি, তুমি গিয়ে আগে কথা বলো।

স্যারের রুমে ঢুকে বললাম – স্যার, আমাকে ক্ষমা করে দিন। ভবিষ্যতে আর কোনোদিন এমনটি হবে না।

স্যার বললেন, তোমার বাবাকে আমি চিনি, তোমার ভাইয়েরা আমার ছাত্র ছিল। তারা তো কোনোদিন এমন করেনি। ঠিক আছে যাও, এসব বাদ দিয়ে পড়ালেখায় মনোযোগী হও। আর কোনোদিন যাতে এ রকম না শুনি।

চেম্বার থেকে বেরিয়ে নিজেকে মনে হলো বিশ্ব জয় করে ফেলেছি। ধীরে ধীরে সবাইকে পেছনে ফেলে আমিই তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু হয়ে গেলাম। প্র্যাকটিকাল ক্লাসে সে কেচো দেখলে ভয় পেতো। তাই আমিই তার কেচোটার বুক চিরে পৌস্টিক নালী বের করে দিতাম নিখুতভাবে।

সে তো দেখে মহাখুশি।

আস্তে আস্তে তার জন্য আমার বুকের এক পাশে চিনচিনে ব্যথা অনুভব করলাম। কিন্তু কোনোদিন তাকে বলিনি যে, তোমাকে আমার ভালো লাগে। যদি সে প্রত্যাখ্যান করে এই ভয়ে। তাকেও কোনোদিন এ ধরনের কথা বলতে শুনিনি।

একদিন হঠাৎ সে বললো, আজকে তোদের বাসায় যাবো।

বললাম, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? মা যদি কিছু মনে করে বসেন তাহলে আমার রক্ষা নেই।

তারপরও সে অনড় হয়ে থাকলো যে, সে যাবেই।

বললাম, ঠিক আছে, যেতেই যদি হয় তাহলে পরশুদিন চলো।

সে বললো, পরশু কেন, আজকে নয় কেন?

বললাম, না এমনি। তাকে আমি বলতে পারিনি যে, পরের দিন ১৪ ফেব্রুয়ারি একটি বিশেষ দিন। কিন্তু সে আজকেই যাবে।

তারপর একটা রিকশা ডেকে এক ঘণ্টা ভাড়া ঠিক করলো।

বললাম, তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে নাকি। এখান থেকে আমাদের বাড়ি মাত্র দশ মিনিটের পথ। তুমি ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া করছো কেন।

সে বললো, এক ঘণ্টা তোমার সঙ্গে রিকশায় ঘুরে তারপর তোমাদের বাড়ি যাবো।

বললাম, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। মফস্বল শহর, এখানে সবাই সবাইকে চেনে। পরে দুজনারই সমস্যা হবে।

আমার কথায় কর্ণপাত না করে এক প্রকার জোর করেই আমাকে রিকশায় তুলে নিল।

এই প্রথম কোনো মেয়ের সঙ্গে রিকশায় উঠলাম। এ আরেক অজানা ভয়। সংশয় আর চরম ভালো লাগার অপূর্ব সমন্বয়। প্রথম কোনো মেয়ের সঙ্গে রিকশায় চড়ার অনুভূতি প্রকাশের নয়, এটা শুধু অনুভবের। তার শরীরের সঙ্গে আমার শরীর যতোবার স্পর্শ হচ্ছে ততোবারই আমার বিদ্যুতে শক খাওয়ার মতো অবস্থা হচ্ছে। আমি লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে যাচ্ছিলাম।

সে বললো, তুমি এমন শামুকের মতো ভেতরে ঢুকে যাচ্ছ কেন, ভালোভাবে বসো।

মনে মনে বলি, এই পথ যেন আর শেষ না হয়।

রিকশা নিয়ে আমরা শহর থেকে বেশ দূরে চলে গিয়েছিলাম। এরপর তাকে নিয়ে আমাদের বাসার সামনে নামলাম। আমার তো বুকের মধ্যে ধড়ফড় শুরু হয়ে গিয়েছে। না জানি মা কোন কাণ্ড করে বসেন। কারণ, এর আগে আমার বড় তিন ভাই কোনো বান্ধবী বাসায় নিয়ে আসার ঔদ্ধত্য দেখাননি।

তার সঙ্গে মায়ের ব্যবহার দেখে তো আমি হতবাক। তার নিষ্পাপ সৌন্দর্যের কাছে মাও নতি স্বীকার করেছেন। পাশে বসিয়ে নিয়ে নাম, বাবার নাম, বাসায় কে কে আছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। চলে আসার সময় মা বললেন, তোমার যখন মন চায় তখন চলে এসো, কোনো সংকোচ করো না।

আমি ভেতরে ভেতরে পুলকিত হলাম। তাকে রিকশায় তুলে দেয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম।

সে বললো, একটু নিউ মার্কেটে চলো একটা পাঞ্জাবি কিনবো।

বললাম, কেন, কার জন্য?

সে বললো, এতো প্রশ্ন করো না তো।

তার ধমক আমার ভালোলাগে।

সে পছন্দ করে একটা পাঞ্জাবি কিনলো এবং আমাকে অবাক করে দিয়ে বললো, এটা তোমার জন্য। আজ আমার একটা বিশেষ দিন। তাই তোমার সঙ্গে সারা দিনটা উপভোগ করলাম। আজ আমার জন্মদিন।

নিজেকে সেদিন খুব ছোট মনে হচ্ছিল যে, আজ পর্যন্ত তার জন্মদিন কবে সেটা জিজ্ঞাসা করিনি বলে। মনে মনে আমিও ঠিক করলাম তাকেও একটা কিছু দেয়া দরকার। পরশুদিন ১৪ ফেব্রুয়ারি এবং ওই দিনটিতেই উপহার দেয়ার জন্য মনস্থির করলাম। তাকে ওই দিন সুনীলের *ছবির দেশে কবিতার দেশে* বইটি উপহার দিলাম। বইটি পেয়ে খুশি হয়ে উপলক্ষ্য জানতে চাইলো সংকোচের সঙ্গে বলেই ফেললাম, আজ ভালোবাসা দিবস।

বইটি পড়ে যে তার খুব ভালো লেগেছে শুনে আমারও ভালো লাগলো।

এভাবে দিন যেতে যেতে এইচএসসি পরীক্ষা চলে এলো। পরীক্ষা দেয়ার পর আমরা দুজন দুদিকে ছিটকে গেলাম। সে চলে গেল রাজশাহীতে তার বোনের কাছে থেকে কোচিং করবে বলে। আমি চলে এলাম ঢাকায়। ইন্দিরা রোডের একটি ম্যাচে উঠলাম এবং মেডিকাল কোচিং রেটিনা-তে ভর্তি হলাম। আমাদের মধ্যে চিঠির দেয়া-নেয়া চলতে লাগলো। তার প্রতিটি চিঠিই ছিল উপদেশে ভরা। খাওয়া-দাওয়া, পড়াশোনা ঠিকমতো করবে, শরীরের প্রতি যত্ন নেবে ইত্যাদি।

এরপর ভর্তি যুদ্ধে অবতীর্ণ হলাম এবং আমি মেডিকালে চান্স পেলাম না। সেই সঙ্গে অন্য কোথাও না। মেডিকাল কোচিং করলে এই এক বিড়ম্বনা। কারণ, অংক থেকে দূরে থাকা হয় বলে ভালো কোথাও চান্স পাওয়া দুরূহ হয়ে যায়। পুরোপুরি হতাশ হয়ে গেলাম যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অপেক্ষামাণ তালিকা থেকেও ডাক পড়লো না। অপরদিকে সে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সাবজেক্টে চান্স পেয়ে গেল।

কয়েকদিন পর তার লেখা একটি চিঠি পেলাম। সান্ত্বনা ও উপদেশে ভরা চিঠিটি পড়ে কিছুটা হালকা হলাম। আমি আবার নতুন করে পড়াশোনা শুরু করলাম। তার ইউনিভার্সিটিতে ঘটে যাওয়া নানান ঘটনা আমাকে লিখে জানাতো। এর কিছুদিন পরেই রক্ত হিম করা তার কাছ থেকে আমার জীবনের সর্বশেষ চিঠিটি পেলাম। সে লিখেছে –

কেমন আছো? ভালো আছো নিশ্চয়। আর সব সময় ভালো থাকো এই কামনা করি। তোমার জীবনের সুদীর্ঘ কণ্টকময় পথের সহযাত্রী হিসেবে আমি তোমার পাশে থাকতে পারলাম না, আমাকে তুমি ক্ষমা করে দিও। আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে আমার ডিপার্টমেন্টের এক টিচারের সঙ্গে। আমি একটা সাধারণ মেয়ে হয়ে তোমার সামনের দীর্ঘ পথের সঙ্গী হিসেবে পাশে থাকার এতোটা দুঃসাহস দেখাতে পারিনি বলে স্বার্থপরের মতো কঠিন বাস্তবতার কাছে নিজের ভালোলাগা স্বপ্নগুলোকে গলাটিপে হত্যা করে বিয়েতে রাজি হয়েছি।

আমাকে ভুল বুঝো না। তুমি আমাকে কোনোদিন না বললেও আমি জানি, তুমি আমাকে কতোটা ভালোবাসো। কিন্তু বাস্তবতা বড় কঠিন। সব কিছু ভুলে গিয়ে নতুন করে আবার শুরু কর। কারণ, তোমাকে অনেক বড় হতে হবে, অনেক বড়। আমি তোমার একজন ভালো বন্ধু ছিলাম, আছি এবং থাকবো। তোমার সুন্দর জীবন কামনায়–

–ঝরা

চিঠিটি পড়তে পড়তে এক সময় লেখাগুলো ঝাপসা হয়ে গেল। মুখে যখন লোনা স্বাদ পেলাম তখন বুঝলাম আমি কাদছি। বাথরুমে গিয়ে আয়নার সামনে দাড়িয়ে কতোক্ষণ কেদেছি মনে নেই। জ্ঞান হয়ে এই রকম বাচ্চা ছেলের মতো কোনোদিন কাদিনি, এতোদিনের জমানো পানি যেন একদিনেই সব বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে।

আজ এতো বছর পর যখন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে জীবন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি তখন কেবলই ভাবি, আসলেই আমাকে সামনে এখনো অনেকখানি কণ্টকময় পথ পাড়ি দিতে হবে। তবে ঝরা আমার জীবনে যে শূন্যতা এনে দিয়েছে তা হয়তো কেউ কোনোদিন পূরণ করতে পারবে না।

শেখপাড়া, চুয়াডাঙ্গা থেকে

এক চুমুতেই

– শাহা–মাসকান্দার

খুব দেমাগ হয়েছে, না? সেই কখন থেকে গলা ফাটিয়ে ডাকছি কানে যায়নি? বলেই হাতের এতো বড় ছেচকি দিয়ে ঘাড়ের ওপর ধপ করে এক ঘা বসিয়ে দিল।

সামলে নিতে গিয়েও বাচতে পারলাম না। খ্যাচাৎ করে গালের ইঞ্চি খানেক ফেসে গেল। একদম নতুন ব্লেড দিয়ে শেভ করছিলাম। গল গল করে রক্ত পড়ছে। মুহূর্তেই আমার গায়ের শাদা স্যান্ডো গেঞ্জিটার কালার চেঞ্জ হয়ে গেল। ব্লিডিং বন্ধ করার জন্য হাতের কাছে কিছু না পেয়ে তার সুতি পিংক রঙের ওড়নাটা গালে চেপে ধরলাম।

আমার এই বেহাল অবস্থায় জলি একদম ঘাবড়ে গেছে। সে ভয় পেলে বা রেগে গেলে তোতলা হয়ে যায়। রিনিঝিনি মিষ্টি গলায় ওর তোতলামো বেশ লাগে। তার দিকে তাকিয়ে দেখি, মুহূর্তেই নাকের ওপর ঝিকিমিকি বালুকনার মতো ঘামের বিন্দু বিন্দু কণা চিকমিক করছে। তার থমথমে ভাব দেখে মনে হচ্ছে, এখনই চিৎকার করে পা ছড়িয়ে কাদতে বসবে।

তু–তুই যে শেভ করছিলি তা পেছন থেকে বু–বুঝতে পারিনি।

তার দিশেহারা ভাব দেখে হাসি পাচ্ছে। সান্ত্বনার সুরে বললাম, ভয় পাসনে, তেমন কিছুই হয়নি। ব্লাড ক্লট করলে একটু বেটনোভেট লাগিয়ে নিলেই হবে। যা ভাগ। তুই কে? তোকে তো চিনি না। এখানে কি প্রয়োজন?

জলি মিনমিন করে বললো, ফুপুর কাছে হলুদের গুড়ো নিতে এসেছিলাম।

ভালো কথা। তো আমার কাছে কি? আমি কি হলুদের বস্তা নিয়ে বসে আছি? আমার এই তর্জন–গর্জনে জলি মনে হয় এবার কেদেই ফেলবে।

বললো, তুই আমার সঙ্গে এমন করছিস কেন? আমি কি করেছি?

না, না! তুই কি কিছু করতে পারিস? তুই তো মহিলা ফেরেশতা। কেন গতকাল সন্ধ্যার কথা কি এরই মধ্যে ভুলে গেছিস? কারেন্ট ছিল না, আমি ছাদে উঠলাম। ছাদ থেকে তোকে তোর ঘরের সামনে দেখতে পেয়ে ডাক দিতেই তুই সাপে কাটা মানুষের মতো তিড়িং করে লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকে গেলি। তুই আমাকে বড্ড অপমান করেছিস। কল্পনাও করতে পারবি না।

আমার সঙ্গে ছাদে তখন জাফরও ছিল। রাজশাহী মেডিকালে পড়ে। শুধু তোকে দেখার জন্যই একদিনের ছুটি পেয়েই চলে এসেছে। আসার পর থেকেই তোর বৌকে দেখা, ভাবীকে দেখা বলে আমার মাথা খেয়ে ফেলছিল। আর তুই কাজটা কি করলি? আমি ডাক দিতেই ব্যাঙের মতো লাফ মেরে গর্তে ঢুকে পড়লি। তোর কাণ্ড দেখে জাফর তো বিব্রত হয়েছেই আর আমিও হয়েছি আহাম্মক।

জলি এবার ফোপাতে ফোপাতে বললো, কেন এমন করেছি তা বলতে তো দিবি, তা না, এক তরফা দোষ চাপিয়ে যাচ্ছিস।

তুই আর কি বলবি? দোষ তো আমারই। অত্র উপমহাদেশের সুন্দরীদের সম্রাজ্ঞী, আমার মতো বগা-চগার ডাকে কেনই বা সাড়া দেবে?

জলি এবার শীতল গলায় বললো, তুই কিছু না বুঝেই বাড়াবাড়ি করছিস। এবার আমি বলবো, চুপচাপ শুনবি। কথা বললেই চড় খাবি। সেই সন্ধ্যায় কারেন্ট চলে যাবার গরমে দম বন্ধ হওয়ার যোগাড়। তুই তো জানিসই, আমি একটুও গরম সহ্য করতে পারি না। একটু স্বস্তির আশায় বারান্দায় খালি গায়ে বসেছিলাম।

আমি অবাক হয়ে বললাম, খালি গায়ে মানে?

গায়ে জামা-কাপড় ছিল না। শুধু একটা ওড়না শরীরের উপর ফেলে রেখেছিলাম। তুই আধারে টের পাসনি। কিন্তু তুই যখন ডাক দিয়েছিলি তখন চমকে উঠেছিলাম। নিজের ওপর ঘেন্না হচ্ছিল। কেন যে এতো বড় আহাম্মকি করলাম, খালি গায়ে বারান্দায় বসতে গেলাম। রাগে নিজের চুল ছিড়তে ইচ্ছা করছিল।

হাসতে হাসতে বললাম, ও, এই ব্যাপার! আচ্ছা জলি, তুই কি মনে করিস, তোর বুকটা একজোড়া হিমালয়, আমি দুইশ হাত দূরে থেকে দেখে ফেলবো?

এখানে জানিয়ে রাখি, তাদের আর আমাদের বাসা পাশাপাশি হলেও মাঝখানে বেশ খানিকটা ফাকা জায়গা। সেখানে বড় বড় তেজপাতা আর দারুচিনির গাছ।

আমার বর্বর ভাষা ব্যবহারে জলি আহত সাপের মতো ফোস করে উঠলো। তোর মুখে যা আসে তুই আমাকে তাই বলবি, কি পেয়েছিস তুই?

শান্ত ভঙ্গিতেই জবাব দিলাম, আমি আর কি পাবো? তুই কি কিছু দিতে জানিস?

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই জলি তিড়িং করে উঠতে গিয়ে আমার ওপর হুমড়ি খেয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। টাল সামলে নিয়ে আমার হাতে ওড়না রেখেই দে ছুট।

আজকেও একই সময়ে কারেন্ট চলে গেল। ঘরের ভেতরের শরতের সন্ধ্যায় গুমোট আবহাওয়া। একটু ঠাণ্ডা হাওয়ার আশায় ছাদে উঠলাম, বেশ লাগছে। সন্ধ্যাটা ধীরে ধীরে গাঢ় হয়ে আসছে। ঝিরিঝিরি বাতাস। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি চাদ-তারা সব ফেরারি হয়েছে। আকাশ জুড়ে কেবল পীত বর্ণের মেঘ। বাতাস ভারী হয়ে আসছে, মনে হয় বৃষ্টি নামবে।

হঠাৎ ঘাড়ে কে যেন হাত রাখলো।

পেছনে না ফিরেই টের পেলাম জলি। তার গায়ে দারুচিনির মিষ্টি গন্ধ। কেন যেন জলিকে আবার রাগিয়ে দিতে ইচ্ছা হলো! ফিসফিসিয়ে বললাম, মামি কি ভাববে? তুই একা আমার সঙ্গে, তাও আবার সন্ধ্যাবেলা।

জলির নিরুত্তাপ কণ্ঠ, যা ইচ্ছা মনে করুকগে ভয় পেলে তো তোকে কিছু দিতে পারবো না। বলেই সামনে এসো মুখোমুখি বসলো।

আমার নির্বিকার প্রশ্ন, তুই কি দিতে এসেছিস?

জলি গাঢ় স্বরে বললো, তুই এতোদিন ধরে যার জন্য অপেক্ষা করছিস।

হঠাৎ জলি নামের চিরচেনা মেয়েটিকে একদম অপরিচিতা মনে হচ্ছে! শাড়ি পরার কারণে রহস্যময়ীও লাগছো। কিশোরী ভাবটা চাপা পড়ে গেছে। আমার কি যেন হয়ে গেল! শরীরের সবটুকু রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করে আছড়ে পরতে লাগলো। আমি ফ্যাসফ্যাসে স্বরে বললাম, তুই কি নাভির নিচে শাড়ির কুচি বাধিস?

হ্যা, কেন দেখবি? বলে আমার সামনে দাড়ালো জলি।

আমি তার কোমরের বাক খাওয়া খাজটা দুই হাতে আকড়ে ধরে তার তলপেটে মুখ গুজে দিলাম। জলির নাভির চারপাশে মনে হলো জাফরানের নেশা ধরানো কড়া গন্ধা। আমি নাক ডুবিয়ে শ্বাস নিচ্ছি, জলি কেপে কেপে উঠছে।

সে হঠাৎ বসে পড়ে, আমার মাথা জাপটে ধরে আমার মুখে তার আগুন গরম ঠোট পুরে দিল।

জীবনের প্রথম চুমু।

জলির ঠোটে বাতাবি লেবুর স্বাদ। নেশারুর মতো চুষেই চলেছি। জলিও প্রথম প্রাপ্তির যন্ত্রণায় ছটফট করছে। আনাড়ি হাতে নিজের অজান্তেই ব্লাউজের হুক খুলে ফেলেছি।

আমার হাত দুটো সচল হতেই জলি আস্তে করে তার ঠোট দুটো আমার ঠোটের কারাগার থেকে মুক্ত করে নিয়ে হাপাতে হাপাতে বললো, বিয়ের আগে এটুকুই তোর ন্যায্য পাওনা ছিল। এর বেশি কিছু তোকে দিলে তোর বদহজম হবে। আর আমার বদনাম হবে।

হঠাৎ সিড়িতে মায়ের গলা পেয়ে চমকে গেলাম।

মা চিৎকার করে বললেন, জলি কি তোর ওখানে? পাঠিয়ে দেতো, তার ফুপা তাকে ডাকছে।

একটু সরে দাড়িয়ে জলি দুই হাতে শাড়ি ঠিক করতে করতে বললো, ছিঃ, ফুপু কি না কি ভাবলো।

ভাবাভাবির কি আছে? আমি কি আমার হবু বৌকে চুমুও খেতে পারবো না?

আমার কথা শুনে জলি, পিচ্চি পোলার শখ কতো? বলে একটা ভেংচি কাটলো।

আমি তাকে ধরতে যেতেই দিল দৌড়।

সে চলে যেতেই কেন যে মনে হলো, এই মেয়েটিকে ছাড়া এক মুহূর্ত পৃথিবীতে বেচে থাকতে পারবো না। জলি শুধুই আমার। তার সব কিছু শুধু আমার জন্য।

জীবনে এই প্রথম অবাক হলাম, ভালোবাসায় এতো তৃপ্তি!

বেচে থাকার নেশা ধরে গেল। কি আশ্চর্য, ভালোবাসার ছোট্ট একটা চুমু! তাতেই জীবন বদলে গেল!

পল্লবী, ঢাকা থেকে

বিবর্ণ

ভাই বোনের মধ্যে আমি ছিলাম ছোট। তাই আমার আদর ছিল সবার চেয়ে বেশি। আর আমি ছিলাম অন্য ভাইবোনদের থেকে ভিন্ন অর্থাৎ খুব ডানপিটে। আমি যখন স্কুলে যাওয়া কেবল শুরু করেছি তখন আমার বড় ভাইয়া আমাকে স্কুলে রেখে আসতেন। কিন্তু অধিকাংশ দিনই স্কুল ছুটির সময় আনতে গিয়ে আমাকে পেতেন না।

প্রথম অথবা দ্বিতীয় ঘণ্টায় স্যারদের চোখকে ফাকি দিয়ে আমারই মতো দুষ্ট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে স্কুল থেকে পালিয়ে সোজা চলে যেতাম গড়াই নদীর তীরে বালু দিয়ে ঘর বানাতে। অথবা *লায়ন্স ক্লাব*–এ বড়আপুদের গান এবং নাচের রিহার্সাল দেখতে। কখন যে দুপুর গড়িয়ে বিকেল এবং বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামতো তা খেয়ালই থাকতো না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে যখন রাতের অন্ধকার পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলতো তখন অনেকটা ভয়ের কারণেই দৌড় দিতাম বাড়ির দিকে।

রুটিন মতোই প্রতি সন্ধ্যায় আম্মু এগিয়ে আসতেন লাঠি নিয়ে। ভাইয়ারা দৌড়ে এসে কোলে তুলে নিতেন আর আপু এগিয়ে আসতেন ভাতের থালা নিয়ে। সারা দিন রোদে ঘুরেছি। কিন্তু খাওয়া হয়নি। তাই আপু এবং ভাইয়াদের সে কি চিন্তা! ভাইয়ার কোলে বসে আপুর হাতে ভাত খেতে খেতে দেখতাম আব্বু চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন এবং আম্মুর দিকে তাকিয়ে হাসছেন। আব্বু মাঝে মধ্যেই বলতেন, তুমি তাকে নিয়ে শুধুই চিন্তা করো, তুমি দেখে নিও আমার এই মেয়ে একদিন খুব নাম করবে। আব্বু মাঝে মধ্যে রবীন্দ্রনাথের উদাহরণও দিতেন।

সারা দিন যতোই দুষ্টুমি করি না কেন রাতে আম্মুর কাছে বই নিয়ে বসতেই হতো এবং প্রতি পরীক্ষাতেই হতাম ফার্স্ট অথবা সেকেন্ড।

লায়ন্স ক্লাবে বড়আপুদের নাচ-গান দেখতে দেখতে আমার খুব শখ হলো আমিও শিখবো নাচ ও গান। আব্বুকে জানালাম আমার মনের কথা।

আব্বু বললেন, আরেকটু বড় হও।

আব্বুর কথা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু চেষ্টা চালিয়েই যেতে থাকলাম। তখন আমাদের কলোনিতে অফিসার্স ক্লাবেও বিকেলে দেখতাম চাচ্চু এবং আন্টিরা গান গাইতেন। লুডো, দাবা, ক্যারম খেলতেন।

আমি সেখানে যাওয়া শুরু করলাম। আব্বু ছিলেন একজন ঊর্ধতন কর্মকর্তা এবং আমার প্রতি আব্বুর স্নেহের কথা কলোনির কারো অজানা ছিল না। তাই বসের মেয়ে হিসেবে আমাকে কেউ সহজে ঘাটাতো না।

সবক্ষেত্রেই ছিল আমার অবাধ বিচরণ। কি ক্লাবে কি অফিসে। গানের প্রতি আমার আগ্রহ দেখে আন্টিরা আমাকে গান শেখাতে লাগলেন। একে একে আরো কিছু অফিসারের ছেলেমেয়ে যোগ দিল আমার সঙ্গে। এক অফিসার চাচ্চুর মেয়ে ভালো নাচতেন। তিনি বিকেলে ক্লাবে আমাদের কয়েকজনকে নাচ শেখাতে শুরু করলেন।

ঝিনুদির কাছে নাচ এবং আন্টিদের কাছে চলতে থাকলো আমার গান শেখা। গান এবং নাচ খুব তাড়াতাড়িই রপ্ত করে নিলাম। তারপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। কোনো অফিসারের অভিষেক অথবা বিদায়ী অনুষ্ঠানে প্রথমেই নাচ এবং গানের জন্য ডাক পড়তো আমার। তাছাড়া স্কুলের বিচিত্রা অনুষ্ঠানে আমার গান এবং নাচ থাকা চাই-ই চাই। এছাড়া কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানেও ডাক পড়তো আমার।

আমি যখন প্রাইমারি ছেড়ে হাই স্কুলে পা দিলাম তখন মাঝে মধ্যেই গান এবং নাচের সময় লক্ষ্য করতাম, আমাকে উদ্দেশ্য করে উঠতি ছেলেরা ফুল ও কাগজের টুকরো ছুড়ে মারতো। অনেক বড় শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে কেটে যেতে থাকলো আমার সোনালি দিনগুলো।

এক সময় ভাবতে লাগলাম, বৃষ্টি ঝরা বর্ষায় কেউ একজন জানালার পাশে আমার কোলে মাথা রেখে শুনবে আমার গান তবেই তো আমার গানের সার্থকতা। জ্যোৎস্না রাতের রূপালি আলোয় পায়ে নূপুর লাগিয়ে আমি নাচবো। আধো আলো আধো ছায়াতে কেউ একজন দেখবে আমার নাচ, জোগাবে প্রেরণা। তবেই তো আমার নাচ শেখা সার্থক!

পেয়েও গেলাম এমন একজনকে। তার হাত ধরে আপনজনদের স্নেহ-মমতাকে বিসর্জন দিয়ে ঘর ছাড়লাম।

কিন্তু একি!

সে আমাকে এক টানে নিয়ে এলো শহর থেকে গ্রামের স্যাতসেতে মাটির ঘরে যেখানে ছিল না কোনো বিদ্যুৎ, গাড়ি - ছিল না বাবুর্চি, মালি বা কাজের লোক।

প্রাচুর্যের মধ্যে বেড়ে ওঠা এই আমি তিনবেলা মাটির চুলার ধোয়ায় চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম। আমার রঙিন স্বপ্নগুলো ধীরে ধীরে তার রঙ হারাতে লাগলো। আধুনিক পোশাক ছেড়ে অঙ্গে জড়ালাম বারো হাত শাড়ি। শুরু হলো আমার নতুন জীবন।

বাস্তব বড়ই কঠিন। মেনে নিলাম। এতো কষ্টের মাঝেও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকলাম নিজের চেষ্টায় দুই একটা টিউশনি করে। কারণ, রাতে আমার স্বামী আমাকে বিছানায় পেয়ে যেমন আনন্দিত হতেন, আমার ভরণপোষণ যোগানোর ব্যাপারে ছিল তার উল্টোটা। আমার শ্বশুর-শাশুড়িকে খুশি করার জন্য আমার স্বামী আমাকে বিনা দোষে সারাক্ষণ বকাবকি করে। এর জন্য তার মাঝে কোনো অনুশোচনাও নেই।

অভিমানে ভরে ওঠে বুক। নিজেকে শুধু একটি ভোগ্যপণ্য ভাবতে মন সায় দেয় না। বিদ্রোহী হয়ে ওঠে মন। তার ডাকে আর আগের মতো সাড়া দিতে পারি না। তাই তো আমার প্রিয় পত্রিকা যাযাদির এক লেখিকার একটি উক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে লিখতে হচ্ছে *নিজেরই ঘরে, নিজেরই সাজানো বিছানায়, নিজেরই স্বামীর দ্বারা ধর্ষিত হচ্ছি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।*

পড়াশোনার পর্ব শেষ হয়েছে। এমএসএস ডিগ্রি নিয়ে এখন আকর্ষণীয় চাকরি করছি। আমার স্বামীর ব্যবসাও এখন দিন দিন উন্নতির দিকে। অভাব গেছে। কিন্তু স্বভাব যায়নি এ বাড়ির কোনো সদস্যের। আমার কষ্ট দেখে অনেকেই বন্ধুর মতো পাশে এসে দাড়াতে চেয়েছে। এই নরক থেকে উদ্ধার করতে বাড়িয়ে দিয়েছে ভালোবাসার হাত। কিন্তু কারো হাত ধরতে মন চায়নি কখনো। যাওয়ার জন্য তো আসিনি এ সংসারে। আমার সব স্বপ্নকে গলা টিপে হত্যা করেছি সে তো এতো সহজে হেরে যাবার জন্য নয়! আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চেষ্টা করে যাবো আমার স্বামীর পাথর হৃদয়ে ফুল ফোটানোর।

১৪ ফেব্রুয়ারি আসে আমার জীবনে অনেক আশা নিয়ে আর চলে যায় এক বুক যন্ত্রণা দিয়ে। কারণ, আমি চাকরি পাওয়ার পর গত দুই বছর এই দিনে আমার স্বামীর জন্য কিনে এনেছি একটি করে লাল গোলাপ। নির্জনে যখন সেটা তুলে দিয়েছি তার হাতে তখন সে ছুড়ে ফেলেছে উঠানে। চিৎকার করে বলেছে, একটা ফুলের দাম পাচ টাকা? কি দরকার ছিল এটা কেনার?

পাশের ঘর থেকে পরক্ষণেই শোনা যায় শাশুড়ির গলা, পাচ টাকার পান কিনলে একদিনের খাওয়া চলে, আর তিনি কিনলেন ফুল। ন্যাকা।

শ্বশুর সুর মিলিয়ে বলে ওঠেন, কারেন্টের বিল দিতে হবে সে চিন্তায় ঘুম নেই। পাচ টাকায় কতো উপকার হয়, তা না, নবাবের বেটি কিনলেন ফুল, ফুটানি কতো!

পাচ টাকার শোক সামলাতে এদের চলে যায় কয়েকটা দিন। আমার ভালোবাসার কোনো দামই নেই তাদের কাছে। আমার স্বামীর পাথর হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে আমার ভালোবাসা আবার ফিরে আসে আমার কাছে। আসছে ১৪ ফেব্রুয়ারিতে আবারও কিনবো গোলাপ। তুলে দেবো তার হাতে। হয়তো আবার ঘটবে আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি। তবুও দেবো। কারণ, তার প্রতি আমার অভিমান আছে। তবে আজও তাকে ঘৃণা করতে পারি না। আমি যে তাকে সত্যিই খুব ভালোবাসি।

সেই দিনের অপেক্ষায় আছি যেদিন সে তার ভুল বুঝবে। অনুশোচনায় কাতর হবে আর আমি সব অভিমান ভুলে নিজেকে উজাড় করে দেবো তার কাছে। কেননা এতো প্রতিকূলতার মাঝেও নিজ গতিতে এগিয়ে চলেছে আমার বিবর্ণ ভালোবাসা।

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

একজন হতভাগ্য স্বামীর কথা

পরকীয়া সম্পর্ক বলতে আপনারা কি বোঝেন? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরকীয়া সম্পর্ক জানাজানি হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সেপারেশন হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আমার বয়স ছেচল্লিশ। কিন্তু আজ আমার বিবাহিত জীবনের সে বাস্তব ঘটনা বলবো তা থেকে প্রতিটি দম্পতির শিক্ষা নেয়া উচিত।

আমি হিন্দু। মুসলমান পরিবারে যখন স্বামী তার বিবাহিত স্ত্রীর পরকীয়া সম্পর্কের কথা জানতে পারে বা স্ত্রী তার স্বামীর পরকীয়ার কথা জানতে পারে তখন যে কোনো একপক্ষ সেপারেশনের জন্য আদালতের কাছে স্বামী বা স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারেন কিংবা তালাক দিতে পারেন। কিন্তু এ রকম ঘটনা হিন্দু দম্পতির বেলায় ঘটলে কি হতে পারে? না পারে একজন স্ত্রী তার স্বামীকে তালাক দিতে, না পারে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জানা যায়, একজন হিন্দু পরিবারের স্বামী বা স্ত্রীর সঙ্গে পর পুরুষ কিংবা নারীর সঙ্গে সম্পর্কের পরও স্বামী-স্ত্রী শুধু মানসম্মানের দিকে চেয়ে কাউকে কিছু না বলে দিনের পর দিন একই বিছানায় রাত কাটাচ্ছে। হিন্দু শিক্ষিত, রক্ষণশীল যৌথ পরিবারে যদি একজন স্বামী তার স্ত্রীর পরকীয়ার ঘটনা জানতে পারে তবুও সে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে না।

পাচ বছর আগে

পাচ বছর আগে হঠাৎ একদিন জানতে পারলাম আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার ভাতিজার দৈহিক সম্পর্ক আছে। রাগে, ক্ষোভে, মানসম্মানের ভয়ে স্ত্রী যেন বুঝতে না পারে এমন করে রাতের পর রাত স্ত্রীর সঙ্গে কাটাতে লাগলাম স্ত্রীকে কোনোরূপ স্পর্শ ছাড়া। একজন পুরুষের জীবনে এর চেয়ে বড় দুঃখের ঘটনা আর কি হতে পারে?

যখন আমি জানতে পারলাম আমার প্রিয় স্ত্রী আমার ভাতিজার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে তখন আমার মনের অবস্থা কি হতে পারে! না পারছি আমি ভাতিজাকে গুলি করে মেরে ফেলতে, না পারছি স্ত্রীকে, না আমি নিজে মরতে। কাউকে বলতে পারছি না কোথায় আমার কষ্ট, কোথায় আমার ব্যথা।

বাড়ির মা-বাবা, ভাই-বোন, সবাই বার বার করে বলছেন, কি হয়েছে, কি হয়েছে? বার বার মনে হতে লাগলো, যে ভাতিজাকে ছোট থেকে বড় করলাম সেই ভাতিজা আমার সঙ্গে এতো বড় বিশ্বাসঘাতকতা করলো!

আমার ভাতিজার বয়স উনিশ ও স্ত্রীর বয়স চৌত্রিশ। প্রথমে আমি সরাসরি আমার স্ত্রীকে বললে স্ত্রী পুরোপুরি অস্বীকার করে।

একদিন পর আমার স্ত্রী তার নিজের ভুল বুঝতে পারে। সারাক্ষণ কান্নাকাটি করতে থাকে। নিজের ভুল স্বীকার করে খুব অনুতপ্ত হয়। সে এতো অনুতপ্ত যে, তার পরকীয়ার সম্পর্ক জানার পরও কিছুদিন বাদে তাকে বলেছি, তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

কিন্তু আমি নিজের কাছে প্রশ্ন করি, আমি কি আমার স্ত্রীকে সত্যিই মন থেকে ক্ষমা করে দিলাম! না, এ দাগ কোনোদিন মোছার নয়। একবার ভাবলাম আত্মহত্যা করবো। যে জীবনে স্ত্রীর সঙ্গে ভাতিজার দৈহিক সম্পর্কের কথা জানতে হয় সে জীবন না থাকলে আরো ভালো হয়।

না, আমি এমন এক হতভাগ্য স্বামী যে, আমার চার বছরের ছেলে ও নয় বছরের মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আত্মহত্যাও করতে পারলাম না। ভাবলাম আমার মৃত্যু তো সমস্যার সমাধান করতে পারবে না।

আবার ভাবলাম, ভাতিজাকে গুলি করে মেরে ফেলবো। তাও পারলাম না। বিশ্বাসঘাতক ভাতিজাকেও মেরে ফেলতে পারলাম না। আমি যে তাকেও ভালোবাসি।

মনে মনে ভাবলাম, যতোদিন বাচবো, স্ত্রীকে আর স্পর্শ করবো না। এই ঘটনা পৃথিবীতে চতুর্থ ব্যক্তি যেন বলতে না পারে। হাজার হলেও আমরা তো হিন্দু!

বর্তমান অবস্থা

আমার মনে হয় এখন আমাদের জীবনে বিশ্বাস নামের শব্দটি আছে। আমার স্ত্রীকে অনেক বুঝিয়ে তার ভুল ভাঙানোর চেষ্টা করেছি। সেও তার নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজেকে বহু আগে শুধরে নিয়েছে।

বিবাহিত জীবনে পরকীয়া সম্পর্কের পরও যে সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলা যায় তা এখন আমার মনে হয় আমরা প্রথম। দাম্পত্য জীবনে আমাদের মতো ঘটনা ঘটতে পারে। হিন্দু পরিবারে যদিও বা এ রকম ঘটনা ঘটে তা পত্রিকার পাতায় বের হয় না।

একসিডেন্টালি স্ত্রীর পরকীয়া ঘটনার পরেও যে বিবাহিত জীবনে সুখী হওয়া যায় তার উদাহরণ আমরা। যে আমি পাচ বছর আগে পৃথিবীর সবচেয়ে হতভাগ্য স্বামী বলে মনে করেছিলাম সেই আমি বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবান স্বামী ও বাবা হিসেবে ভাবছি। এখন ভাবছি পাচ বছর আগে যদি রাগের মাথায় একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতাম তাহলে তিনটি জীবন নষ্ট হয়ে যেতো।

সুপ্রিয় পাঠক, আপনারা আমাদের জন্য আশীর্বাদ করবেন। আমি বিশ্বাস করি, Purity can come from impure water, if you boil its character – দূষিত পানি থেকেও শুদ্ধতা জন্ম নিতে পারে, যদি আপনি তার চরিত্রকে শোধন করে নেন।

নাম–ঠিকানা বিহীন

নিজস্ব রঙ

– ছুটি

জীবনে যেমন কষ্ট পেয়েছি তেমনি ভালোবাসাও পেয়েছি অনেক। আমার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর নিজস্ব রঙ আছে। একান্ত অবসরে ঘটনাগুলোর রঙগুলোকে সাজিয়ে দেখি। কি পেলাম আর কি পেলাম না তা নিয়ে কখনো হিসাব করি না। তাতে হতাশা আরো বেড়ে যায়।

১৯৮২ সাল। ক্লাস ওয়ানে পাড়ি। তখন ছিল শীতকাল। বাবার শখ মাছ ধরার। কলেজে অধ্যাপনার পাশাপাশি সময় পেলেই বাড়ির পাশের বিলে চলে যান জাল নিয়ে। যেদিনের ঘটনা সেদিন বাবার সঙ্গে আমি ও আমারই সমবয়সী কাজের মেয়ে গিয়েছি মাছ ধরা দেখতে। ছোট–বড় পুটি, চান্দা, টেংরা আরো অনেক রকম মাছ ধরা পড়ছে প্রতিবারই।

এরপর জালে ধরা পড়ল বিশাল সাইজের এক মাছ। আমি তো মহা খুশি।

আমার খুশি দেখে মাছের মুখে দড়ি দিয়ে বেধে আমার হাতে ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন সাবধানে বাড়ি যেতে।

বাবা সিগারেট খেতেন। তার সঙ্গে থাকা দামি লাইটারটা আমার সোয়েটারের পকেটে রেখে বললেন, এটাও যেন সাবধানে নিয়ে যাই।

আমার অতোসব খেয়াল রইলো না। মাছ নিয়ে লাফাতে লাফাতে বাড়ি যাচ্ছি আর পথে সবাই জানতে চাইছে কতো দাম? খুব গর্ব করে সবাইকে বলছি, আমার বাবা জাল দিয়ে ধরেছেন। ভাইবোন সবার বড় আমি। বাড়ি ফেরার পর ছোট ভাইবোন, আম্মু, খালাম্মু সবাই মাছ দেখে খুব খুশি।

মাছ কেটে ভাজা হচ্ছে এমন সময় বাবা ফিরে এলেন। গোসল সেরে এসে আমার কাছে লাইটার চাইলেন।

পকেটে হাত দিলাম, লাইটার নেই। এটার কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। কোথাও খুজে পাওয়া গেল না। তখন মনে হলো যে, সারা রাস্তায় তো মাছ নিয়েই লাফাচ্ছিলাম। কোনো এক ফাকে লাইটারটা পকেট থেকে পড়ে গেছে।

প্রচণ্ড মার খেলাম বাবার হাতে। এভাবে মারবে তা কখনো কল্পনা করিনি। মেরেও যখন রাগ কমছে না তখন ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন এই বলে যে, লাইটার যদি আনতে পারি তবেই যেন ফিরে আসি।

রাতের অন্ধকারে বাড়ির সামনে দাড়িয়ে কাদছি।কোথায় যাবো বুঝতে পারছি না। শৈশবের সেই সবুজ দিনটা খুব বর্ণহীন মনে হয়েছিল সেদিন।

দুই ঘণ্টা পর আম্মু এসে চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বাসায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

ক্লাস টুতে পড়ি তখন। প্রতিদিনই আম্মুর কাছে পড়তে বসি। সেদিন আম্মু অসুস্থ থাকায় বাবার কাছে পড়তে বসেছি। ওয়ার্ড মিনিং পড়ছিলাম। বাবা পড়ালেন This - দিস, That - দ্যাট।

পড়তে পড়তে কখন যেন দ্যাট থেকে ট্যাট হয়ে গেল।

বাবা শুনে বললেন, কি পড়ছিস?

বুঝতে পারলাম উচ্চারণে ভুল হচ্ছে। যতোই মনে করার চেষ্টা করি ট্যাট ছাড়া অন্য কিছুই মনে পড়ছে না।

আমার বাবা ছিলেন ডাকসাইটের বদমেজাজি। শেষবারের মতো সাবধান করে দিয়ে বললেন, এবার যদি মনে করতে না পারিস তাহলে আস্ত রাখবো না।

পরিণামের কথা চিন্তা করে এবার ট্যাটও ভুলে গেলাম। এমন জোরে এক লাথি মারলেন যে বিছানা থেকে ছুটে গিয়ে দরজার কাছে পড়লাম। চারপাশের সব কিছুকে হলুদ মনে হলো। জন্ডিসের মতো *হলুদ ভালোবাসা* উপহার পেলাম বাবার কাছ থেকে। ছোট শরীরটায় যতো ব্যথা পেয়েছিলাম তারচেয়ে অনেক ব্যথা পেয়েছিলাম মনে।

ক্লাস সিক্সে পড়ি তখন। হেমন্তের কোনো এক ক্লান্ত দুপুর। বাসার সবাই ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়াতে জানালার কাছে এসে দাড়ালাম। আমার বন্ধু–বান্ধবীরা কয়েকজন মিলে *বৌ ছুই* খেলছে। খুব ইচ্ছা হচ্ছিল ওদের সঙ্গে গিয়ে খেলতে। কিন্তু এই সময় বাইরে গেলেই বকা খাবো। তাই জানালার গৃল ধরে দাড়িয়ে খেলা দেখছি আর হাসছি।

হঠাৎ শব্দ করে হেসে ফেলতেই পাশের রুমে ঘুমিয়ে থাকা বাবার ঘুম ভেঙে গেল।

ভাবলাম ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি বলে হয়তো বকা শুনতে হবে।

কিন্তু আমাকে খুব অবাক করে দিয়ে বাবা একটা তরকারি কাটার ছুরি এনে আমার পেটে চেপে ধরলেন আর বললেন, বল এতোক্ষণ কোন ছেলের সঙ্গে আড্ডা মারছিলি? চুলের ঝুটি ধরে কয়েকটা চড় মারলেন।

এতো বেশি অবাক হয়েছিলাম যে মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হলো না।

কথা না বলায় আরো কয়টা চড় খেলাম।

হেমন্তের বিকেলে নির্মেঘ আকাশে জড়িয়ে থাকা আকাশি রঙের ভালোবাসাগুলো হঠাৎ ছাই বর্ণের হয়ে গেল। বাবা নামের মানুষের প্রতি আজ হৃদয়ে কোনো শ্রদ্ধা খুজে পেলাম না। যে বাবা–মা সন্তানের সবচেয়ে কাছের মানুষ সেই বাবাকে আজ আপন ভাবতে পারলাম না। মন থেকে একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেল।

মেয়েদের যে বয়সটা নিয়ে মায়েরা খুব চিন্তিত ও ভীত থাকেন ঠিক সেই বয়সেই প্রেমে পড়ে গেলাম উচ্চ শিক্ষিত এক যুবকের। একটা আশ্রয় খুজছিলাম যেখানে একটু ভালোবাসা পেতে পারি। কারণ, বাবার অত্যাচার শুধু আমি একা নই, বাড়ির প্রতিটা মানুষকেই সহ্য করতে হতো। আমার প্রাণপ্রিয় আম্মুও তা থেকে রেহাই পেতেন না।

প্রেমের প্রথম কিছুদিন স্বপ্নের মতো মনে হলেও অচিরেই বুঝলাম ভুল করেছি মানুষ চিনতে। বয়সের বিস্তর ব্যবধানের কারণেই হয়তো দুজনের মানসিকতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এছাড়াও আমার প্রতিটা বিষয়ই তার নিজের মতো করে সে পেতে চাইতো। তার পছন্দ মতো চলতে আমাকে বাধ্য করতো। মনের একাকীত্ব দূর করতে আশ্রয় হিসেবে যাকে পেতে চাইলাম তাকে এখন শুধু বাড়তি কষ্ট মনে হচ্ছে। তার যন্ত্রণার মাত্রা এতোই বেড়ে চললো যে, এক সময় বাধ্য হলাম সেই অসম সম্পর্ক শেষ করতে। ভালোবাসার অনেক রঙের সঙ্গে এবার *কালো* একটা রঙ যোগ হলো মনের আঙিনায়।

আবারও প্রেমে পড়লাম। তবে এবার পরিণত বয়সে। যদিও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ওপথে আর না তবুও আমিই বুঝতে পারিনি আবার কখন পথ ভুল করে সেই পথে চলে গিয়েছি।

মনে হলো এবার যেন পূর্ণতা পেলাম। আমার একাকী জীবন শেষ হলো। প্রতিদিন দেখা হতো আমাদের। ও সকালে অফিস যাবার পথে আমাকে কলেজে দিয়ে যেতো আর হাতে তুলে দিতো গত রাতের লেখা চিঠিখানা। কলেজ থেকে ফিরে ফোনে কথা হতো এবং অফিস শেষে প্রতিরাতেই একবার হলেও সে আসতো আমাদের বাড়ির সামনে।

দুজন মিলে ইচ্ছামতো বেড়িয়েছি অনেক জায়গায়। ভালোবাসার নীল রঙটা যে এতো সুন্দর তা আজ উপলব্ধি করতে পারলাম। আমার সমস্ত কষ্ট, মনের ভেতর জমে থাকা এক সমুদ্র যন্ত্রণা সে ভুলিয়ে দিয়েছে নির্লোভ ভালোবাসা দিয়ে।

ওর কথা বাড়িতে জানাজানি হতেই মার খেলাম আবার। মনের মধ্যে আবার ধাক্কা খেলাম। এই বয়সে মার খেতে হবে এতোটা ভাবিনি। আমার একাকীত্ব ঘোচাতেই তো তাকে বন্ধু হিসেবে বরণ করেছি। আমার এই একাকীত্বের জন্য তো আমার পরিবার দায়ী। ছেলেমেয়েদের সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় সবচেয়ে ভালো বন্ধু বাবা মা যখন চায় যে সন্তানের সঙ্গে তার সম্পর্ক বন্ধুর মতো না হয়ে ভয়-ভীতি আর কড়া শাসনের সম্পর্ক তৈরি করতে তখন তাদের মাঝে অজান্তেই যোজন যোজন দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়।

আমার প্রেমকে হারাতে চাই না। সিদ্ধান্তে আমি অনড়। পরিণতিতে এবার শুরু হলো চোর পেটানোর মতো করে পেটানো। এবার ভালোবাসার আরেক রঙ দেখতে পেলাম। লাল রঙ, রক্তের লাল রঙ।

অনেক চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে, অনেক গঞ্জনা সহ্য করে অবশেষে ছয় বছরের প্রেমের সমাপ্তি ঘটিয়ে আমাদের বিয়ে হলো। আমার পাথর কঠিন বাবা অবশেষে কিছুটা নমনীয় হয়ে বিয়েতে মত দিলেন।

নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু হলো। স্বপ্নের মানুষের সঙ্গে স্বপ্নের সংসার গড়ার স্বপ্ন। তবে স্বপ্ন যে খুব সহজে বাস্তব হবে না তা অচিরেই বুঝতে পারলাম। কষ্টগুলো যেন আমাকেই ভালোবাসে, সঙ্গ ছাড়তেই চায় না।

বিয়ের পর উপহার স্বরূপ পেলাম শ্বশুরবাড়ির বৈরী পরিবেশ। গ্রাম্য মানসিকতার অল্প শিক্ষিত শ্বাশুড়ির চোখে আমার কোনো গুণ ধরা পড়লো না। সবই কেবল দোষ। আমার সব কথায়, কাজে ভুল খুজে বের করা তার প্রধান কাজ হয়ে দাড়ালো।

এমন পরিস্থিতির সঙ্গে আগে পরিচিত ছিলাম না। তাই তাল মেলাতে পারছিলাম না।

এতোদিন লালন করে রাখা স্বপ্নটাকে আজ সত্যি স্বপ্নই মনে হলো। জীবনটাকে বর্ণহীন মনে হলো। শাদা রঙের জীবন। অসহনীয় পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে ফিরে এলাম আগের ঠিকানায়।

জীবনটাকে যখন অপ্রয়োজনীয় অর্থহীন মনে হচ্ছে, মাঝে মধ্যে বিপদজনক কিছু করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি ঠিক তখনই জীবনে ঘটে গেল এক নতুন ঘটনা। মেয়ের মা হলাম। খোদার কাছে সবসময় প্রার্থনা করতাম আমার যেন মেয়ে হয়। সে এবার আমাকে নিরাশ করেনি। যখনই আমার ছোট্ট সোনার চেহারা দেখি, সঙ্গে সঙ্গে এতো বছরের সব কষ্ট ভুলে যাই। এতোদিনে নতুনভাবে বেচে থাকার কারণ খুজে পেয়েছি। এখন আমি ভালোবাসার নতুন আরেক রঙের সন্ধান পেয়েছি। গোলাপি রঙের ভালোবাসা। আমার দেড় বছর বয়সের গোলাপি রঙের লক্ষ্মীসোনা পরম নির্ভরতায় ওর বিছানায় ঘুমিয়ে আছে।

আমার জীবনে যা কিছু ঘটেছে, যতো কষ্ট বয়ে বেড়েয়েছি এতো বছর ধরে, তেমন কোনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমি আমার মেয়ের জীবনে ঘটতে দেবো না, কিছুতেই না।

ঢাকা থেকে

কাঙ্গাল

– সুমি আক্তার

আমি সুমি। প্রথম ভালোবেসেছিলাম সাহার–কে। সে ছিল মাতাল। দিনে সে পরনারীতে আসক্ত থাকতো। রাতে সে আমার উরুর সন্ধি স্থলের ঘ্রাণ নিতো। আমি তাকে সব বিলিয়ে দিতাম। কারণ, আমি তাকে ভালোবাসতাম, আমি তার বিবাহিত স্ত্রী ছিলাম।

সে কখনো চাইতো না আমার জরায়ুতে তার সন্তান হোক। তার ভালোবাসা ছিল মেকি।

এভাবে দিন চলে যায়। আমার কোলে জন্ম হয় একটি ছেলে সন্তান। আমার স্বামী ও শ্বশুর–শাশুড়ি একদিন অবুঝ সন্তানকে ভুল ওষুধ খাইয়ে হত্যা করে।

আমি এমনই মা, কিছুই করতে পারিনি আমার সন্তানের জন্য। নিজ হাতে তাকে কবর দিলাম বৃটিশদের মাটিতে। সেখানে ছিলাম অসহায়। বাংলাদেশে এনে আমাকে পাগল, মানসিক রোগী বলে ডির্ভোস দিয়ে দেয়। হায়রে আমার ভালোবাসা।

শুরু হলো আমার দ্বিতীয় জীবন। নাম তার সাম–সুমন। এই মানুষটি ছিল আমার ছায়ার মতো। সুমন ছিল বিদেশি। বাংলাদেশে ঢাকায় তার বিশাল বাড়ি। বাড়ির সামনে সে লিখেছিল শান বাধানো পাথরে, *সুমি ভিলা*। অবসরেই সে আমাকে নিজ হাতে রান্না করে খাওয়াতো। আমার অসুস্থতা তাকে করতো বিচলিত। আমার সেবা–যত্নে সে ছিল মগ্ন। এতো আনন্দ, এতো ভালোবাসা আমি আর কোথাও পাইনি। আমার যা পছন্দ তা–ই সে কিনে আমাকে খুশি করতো।

আমার প্রতি এতো ভালোবাসা, এতো আদর আমার ভাগ্যে বেশি দিন সইলো না। আল্লাহ আমার কাছ থেকে তাকে নিয়ে গেল।

আমি আবার একাকী, নিঃসঙ্গ একজন মেয়ে। বন্ধু–বান্ধব যারাই বুঝতো আমি নিঃসঙ্গ তারাই আমাকে প্রশ্ন করতো এই যৌবন নিয়ে আমি কি করে থাকি। এরা চাইতো তাদের সঙ্গে বিছানায় যাই। আমি তাদের একদম সহ্য করতে পারি না।

এক বছর পর আমার তৃতীয় জীবন মানে আমার দ্বিতীয় বিয়ে হয়। পাত্রী দেখার দিন যখন দেখলাম আমার শরীরে হাত দিচ্ছে তখনই ভেবেছি লোকটি কেমন হতে পারে। ভাগ্যক্রমে তার সঙ্গেই আমার জীবন আরম্ভ হয়। অবহেলা বলতে যা বোঝায়! তার বাচ্চাদের সে আদর করে। রাতে সে কোনো সেক্স অনুভব করে না। তাই তার স্ত্রীর দরকার নেই। তার মন খুশি করতে হলে কি করতে হবে তা একজন ফেরেশতাও বলতে পারবে না।

সে আলাদা বিছানায় থাকে। ভদ্রভাবে কথাও বলে না। সে আমার হাতে টাকা–পয়সা দিতে রাজি না। আমি যদি দুদিন না খেয়ে থাকি তাহলে সে জিজ্ঞাসাও করে না, কেন খাইনি? কোনো কারণে ডাক্তারের কাছে যেতে চাইলে সে আমার সঙ্গে যাবে না। বাসার কোনো জিনিস কিনতে হলে সে আমার কাছে জিজ্ঞাসাও করে না। আমার পছন্দের খাবারগুলো সে আনে না। কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয় না। সে আমাকে সন্দেহ করে না। কথায় কথায় সে আমাকে ঘার ধরে বের করে দেবে বলে। মারতে আসে, ছোটলোকের বাচ্চা বলে গালি দেয়।

আমার বয়স এখন বত্রিশ। আমার একটি সন্তানের মা হতে ইচ্ছে করে। সে বাচ্চা চায় না। কারণ, আগের ঘরে তার তিনটি মেয়ে আছে। সে আমাকে ডাক্তার দেখানোর ভিজিটও দেবে না। আমার সঙ্গে কোথাও যেতেও আগ্রহী না। কথায় কথায় বলে আমাকে চলে যেতে।

আমি কোথায় যাবো? স্বামীর বাড়ি নাকি মেয়েদের শেষ ঠিকানা। সে তার বাচ্চা নিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকে। আমাকে জায়গা দেয় না। বাধ্য হয়ে আমাকে ফ্লোরে ঘুমাতে হয়। আস্তে আস্তে তার প্রতি আমার ঘৃণা হয়। কিন্তু তাকে ভালোবাসতে চাই। কেন এতো অবহেলা আমার প্রতি?

এখন আমি আর কাউকে ভালোবাসতে চাই না। আমাকে কেউ ঈদ, বিয়েবার্ষিকী, জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানায় না। আমি একজন ভালোবাসার কাঙ্গাল। আমি চাই আমার স্বামীর আদর সোহাগ। কিন্তু পাই না। আমার এ জীবন ভালোলাগে না। আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে।

আমার আত্মহত্যার পর আমার স্বামী যেন আমার মৃতদেহ না দেখে।

আমার মা-বাবা যেন আমারই কেনা জায়গাতে কবর দেয়। কবরের নেমপ্লেটে যেন আমার স্বামীর নাম না দেয়া হয়। আমার নামের পর যেন বাবার নাম থাকে। কারণ, আমার দুঃখের দিনগুলোতে তারাই আমার পাশে ছিলেন।

কারো প্রতি আমার রাগ নেই। আমার ভাগ্যে যা ছিল তা-ই হয়েছে।

আমার স্বামী মোবাইলে যে মেয়েটির সঙ্গে ভালোবাসার কথা বলে সে যেন আমার মৃত্যুর পর তাকেই বিয়ে করে সুখী হয়। আমি তোমার এবং তোমার হবু বৌ-এর জন্য দোয়া করি।

পূর্ণ ঠিকানা বিহীন, ঢাকা থেকে

শুধু চোখের আড়াল

তখন ক্লাস ফাইভের ছাত্রী আমি।

চঞ্চল মন ও পড়াশোনায় অমনোযোগী হওয়ায় আমার প্রাইভেট টিউটর রাখা হয়েছিল তিনজন। তারই একজন আমার সবচেয়ে প্রিয় টিউটর, আত্মীয়তার টানাপোড়নে যাকে ভাইয়া বলেই ডাকতাম। আমার বাবা-মায়ের কাছে ছিলেন পুত্রতুল্য এবং আমরা তার খুবই স্নেহভাজন বলে তিনি একে নিজের বাসাই মনে করতেন। অনার্স পড়তেন। দেখতে বেশ হ্যান্ডসাম, নব্যতায় উদ্ভাসিত সুরেলা কণ্ঠে গুছিয়ে কথা বলতেন। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও চিত্ত নিংড়ানো বিষয় ছিল তার ঝকঝকে দাত। হাসলে আমি আড় চোখে লুকিয়ে দেখতাম। লেখাপড়ায় অত্যন্ত মেধাবী এবং টিচিংয়ের ক্ষেত্রে ছিলেন আন্তরিক। তার সুন্দর বাচনভঙ্গি আমাকে আকৃষ্ট করতো যখন-তখন এবং আমি বেশ সমীহ করতাম। সব কিছু সমান তালেই চলছিল।

কয়েকদিন যেতে না যেতেই একদিন চোখে চোখ পড়ে গেল। দেখলাম, তিনি অপলক আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। প্রায়ই দেখতে পেতাম। ক্রমান্বয়ে এক দেড় ঘণ্টার স্থলে দুই তিন ঘণ্টা পড়াতেন অর্থাৎ গড়ে অর্ধেক সময় পড়ানোর মাঝে কাটাতেন। কিন্তু আমি তখন ইদুর, ছুচো ও বেতে ইদুরের ইংরেজি পৃথকভাবে না জানলেও অন্তত *র‍্যাট* শব্দটা বুঝতে পারতাম বিধায় অত্যন্ত সংকোচে পড়তে বসতাম। দেখতে তেমন ফর্শা না হলেও আমার শ্যামবর্ণ চেহারায় শারীরিক গঠন হয়তো বা ছেলেদের নজর কাড়ার মতোই ছিল। কাজেই টিউটর ভাইয়ার দেয়া স্নেহ Cuddle to Caress অর্থাৎ ক্রমেই আদরের পরিমাণটা বৃদ্ধি পেতে থাকলো।

আমার পড়ার রুমটা ছিল পৃথক। সাধারণত কেউই ওই রুমে যেতো না। শুধু আমার পিচ্চি ভাইটা মাঝে মধ্যে তিড়ি-বিড়িং করতে করতে আসতো এবং লম্ফ-ঝম্ফ মেরে আবার ছুট।

আশপাশ যখন নিঃশব্দ তখন তিনি আমাকে কাছে টেনে বসাতেন। মাঝে মধ্যে আমার গায়ে হাত বোলাতেন এবং অনেক সুন্দর করে পড়া বোঝাতেন। হাসিমাখা সুন্দর ভাষণে আমার মনটা যখন পাঠ্যসূচিতে কেন্দ্রিভূত হতো তখন তিনি আমার কপালের চুলগুলো সরিয়ে দিতেন। যখন বলতেন বুঝতে পেরেছো এবং আমি জবাব দিতাম জি, তখন আদর করে চুমু খেতেন।

ক্লাস ফাইভ থেকে সিক্স সেভেনে ওঠার পরও আমার সঙ্গে তিনি একই আচরণ করতেন। তারপর এইটে উঠলাম। আমার ব্লুমিং এজ। তিনি যখন আগের মতো আমার স্পর্শকাতর স্থানে হাত বোলাতেন তখন সহ্য করতে পারতাম না। খুব ধৈর্য ধারণ করতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু কতোদিন?

একদিন আমি সহ্য করতে না পেরে তার হাত এক ঝটকায় সরিয়ে দিলাম। তিনি তখন ছোবল মেরে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি বাকরুদ্ধ হয়ে কাপতে থাকি। সম্পর্কটা Cuddle থেকে Hug–এ পরিণত হয়ে গেল। দুমড়ে–মুচড়ে একাকার করে দিলেন আমাকে। আমার দুই চোখ টকটকে হয়ে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ আমার পিচ্চি ভাইয়ের ছুটে আসার আওয়াজ আমার কানে এসে বাজলো। চোখ খুলে যেতেই দেখি জানালা খোলা। দ্রুত সুঠাম দেহের বাহু থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিলাম। লজ্জায় এক মুহূর্তও বসে থাকতে পারিনি তার সামনে। ছুটে চলে গেলাম নিজের বেডরুমে।

তারপর থেকে হয়ে গেলাম দুজন দুজনার, হাজারো চিহ্ন একে দিলেন আমার দেহ–মন–প্রাণ জুড়ে। *তুম বিন জিয়া ক্যায়সে।* যতোক্ষণ আমি তার দুই বাহুর অভ্যন্তরে থাকতাম ততোক্ষণ মনে হতো এটাই বুঝি পৃথিবীর সবচেয়ে কলুষমুক্ত নিরাপদ জায়গা।

আমাদের সম্পর্কের কথা বাসার কেউই জানতো না। কিন্তু মহল্লায় কিভাবে যেন রিউমার ছড়িয়ে পড়লো যে, আমি তার বাগদত্তা। তবে উঠতি বয়সের কোনো ছেলে আমাকে কখনো বিরক্ত করার সাহস পায়নি। কেননা আমার টিউটর ছিলেন মহল্লায় সিনিয়র ভাইদের একজন। আমার অনেক বান্ধবীরা তো তাকে বরাবর দুলাভাই বলেই সম্বোধন করতো। তার বাসা ছিল আমাদের পাশের বাসার নিচ তলায় ব্যাচেলর কামরায়। এমনো দেখা গেছে, রাত তিনটায় বারান্দায় আমার দিকে মুখ করে তিনি দাড়িয়ে আছেন। ঠিক একই অনুভূতি নিয়ে আমিও অনুরূপ। অথচ কি কাণ্ড, এ সাক্ষাতের কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না।

দিন পেরিয়ে একদিন সুখের স্বপ্ন বাস্তবায়নের ঘণ্টা বেজে উঠলো দুই প্রান্তে। সে তখন মাস্টার্স শেষ করে বেরিয়েছে এবং একটি প্রাইভেট ফার্মে চাকরিরত। আমি ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছি। আমার পাত্র হিসেবে সে ছিল একশ পার্সেন্ট ফিট। অথচ আমার বাবা–মা রাজি নন। কেননা বাহ্যিক দৃষ্টিতে পুত্রতুল্য হলেও প্রকৃতপক্ষে সে ছিল আমার অহংকারী মায়ের চোখে বেমানান, গ্রামের গরিব ঘরের ছেলে। তুলনা করেছেন আমার প্রতি মাসের খরচ আর তার মাসিক আয়ের সঙ্গে।

অন্যদিকে তার বাবা–মা কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। কারণ তারা আর্থিক দিক থেকে আমাদের সমান না হলেও মোটামুটি সচ্ছল ছিলেন। তবে এটা সত্য যে, আমার মেধাবী টিউটরের লেখাপড়ার ব্যাপারে আমার সচেতন বাবার পৃষ্ঠপোষকতা ছিল উল্লেখযোগ্য। সব কিছু জেনে ছেলেপক্ষ নিজেদের সম্মান রক্ষায় ছিলেন অটুট। টিউটরও চাননি অকৃতজ্ঞ হতে, বাবা–মায়ের সম্মানহানি করে পালিয়ে আমাকে নিয়ে ঘর বাধতে। তিনি চাননি চিরদিন অবহেলা আর লাঞ্ছনার মাঝে ডুবে থাকতে। মাথা উচু করে দাড়াবেন এটাই ছিল তার লক্ষ্য।

আমিও ব্যর্থ, কনভার্ট করতে পারিনি আমার বাবা–মাকে। আত্মহনন কোনো সমাধান নয়। কাজেই অভিমান ছাড়া আর কি করতে পারি! আমার আগ্রহে বাবার আপত্তি না থাকলেও মায়ের কারণেই ছিলেন নিউট্রাল। অশান্তি আনতে চাননি সাজানো সংসারে। স্বপ্নের মাঝে সুখ খুজে নেয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছি। একটু ভালোবাসার জন্য পরিস্থিতি ও বাস্তবতা মোকাবেলায় ছিলাম বদ্ধপরিকর। অথচ ভাবতে পারিনি, চোখের আড়াল থেকে একদিন মনের আড়াল হওয়ার ঘণ্টা শুনতে হবে আমাকে।

এমনিভাবে বেশ কয়েকটি ভ্যালেনটাইনস ডে অতিক্রম হয়েছিল আমাদের জীবনে। আজ এই ভালোবাসা দিবস তোমাকে জানাতে চাই, তুমি যেখানেই যাও, ভালো থেকো। শুধু জেনে রেখো, তোমার দেয়া স্মৃতি চিহ্ন

গত সাত বছর ধরে একাধিক বেনারসি মুক্ত করে রেখেছে আমাকে। তাই আজও প্রহর গুণছি। সেই যে অভিমান করে নিরুদ্দেশ হয়েছো, তাতে চোখের আড়াল হয়েছো শুধু, মনের আড়াল নয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা থেকে

লেটার মার্ক

ওয়াহেদ হোসেন

স্যার, একটা আবদার রাখতে হবে। বললো রাজা।

বলো।

ফারুক ও রাজা কোরাস করে গলা মেলালো, জি স্যার, একটা আবদার।

বলোই না! বললেন রাজ্জাকস্যার।

আগে কথা দেন, আবদার রক্ষা করবেন।

না দেখে, না বুঝে কোনো শিক্ষিত মানুষ কথা দেয়? যুক্তিযুক্ত হলে চেষ্টা করবো।

রাজা বললো, অবশ্যই অযৌক্তিক বাহানা আমরা করবো না।

বিএ ক্লাসের বাংলা খাতা বেশ কয়েকদিন ধরে দেখা চলছে। একটা খাতায় নাম্বার যোগ করতে গিয়ে ফল দাড়িয়েছে আটাত্তর। ফলে খাতাটা বিশেষ রূপে চিহ্নিত হয়েছে। আবুল হোসেন একজন অধ্যাপক। ফারুকও। ছাপাখানার মালিক রাজা। রাজ্জাকস্যারের বাসায় তার ভক্ত ছাত্রছাত্রীরা আড্ডা দেয়। বলা চলে নিয়মিত। একগাদা খাতা যখন আসে তখন স্যার হিমশিম খান। তিনি প্রিয় ছাত্রের দলকে চা পানের নিমন্ত্রণও দেন। বিকেল থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত খাতা দেখা চলে। বরং বলা চলে খাতা দেখা ও গুলগপ্প চলে সমান্তরালে।

স্কুল শিক্ষক ও ছাত্র সম্পর্ক থেকে কলেজ শিক্ষক এবং ছাত্র সম্পর্ক সম্পূর্ণ আলাদা। স্কুলে একগাদা বই-খাতা নিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে দূরত্ব রেখে বসবাস করতে হয়। চড়, থাপ্পড়, কানমলা, বেত, এরা কখনো কখনো অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

কিন্তু কলেজ! একটি মাত্র খাতা যাকে রাফ বা খসড়া খাতা বলে সেটাকে বগলদাবা করে ক্লাসে যাতায়াত করা যায়। স্যাররা এখানে ভাবগম্ভীর খুবই কম হন। কানমলা-নাকমলার ঝুট-ঝামেলা নেই। পড়ার জন্যে ক্লাস শুরু হতে শেষ পর্যন্ত একই ক্লাসে ঠায় বসে থাকতে হয় না। বিষয় হতে বিষয়ান্তরে ক্লাস বদলে আরেক ক্লাস রুমে যেতে হয়। এখানে ছেলেমেয়ের সহশিক্ষা থাকায় এক ধরনের রোমান্স করা যায়।

রাজ্জাকস্যার সদালাপী মিশুক। তার সঙ্গে একবার যে প্রিয় হয়ে যায় সে ক্রমেই প্রিয়তর হতে প্রিয়তমে এগোতে থাকে। সেই প্রিয়তার ভিত্তিতে খাতা দেয়ায় বেগার দেয় প্রিয় ছাত্ররা। স্যার মধ্যমণির মতো বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেন প্রয়োজন অনুযায়ী। এতো খাতা দেখা একজন এক্সামিনারের পক্ষে বেশ কষ্টকর।

এই খাতাটা স্যার। এটা আপনি একটু দেখবেন এবং সম্ভব হলে মাত্র দুটো নাম্বার বাড়িয়ে দেবেন। খাতাটা এগিয়ে দিল রাজা।

প্রিয় ছাত্ররা খাতা দেখে নাম্বার দেয়ারকালে পেন্সিলে হালকা করে নাম্বার লিখে দেয়। স্যার সেটায় একটু চোখ বুলিয়ে রাবার দিয়ে মুছে বলপেন দিয়ে হয় আগের নাম্বার বহাল রাখেন অথবা একটু হেরফের করে দেন। অনেকটা হেড ক্লার্ক ও অধীনস্থ কেরানিকুল সম্পর্ক।

হুম। স্যার দম নিলেন। বললেন, খাতাটা আলাদা করে রাখো। আমি রাতে দেখবো।

খাতাটা আলাদা করে রাখা হলো।

স্যার।

বলো।

গতকালকের বিষয়টা?

বিশেষ খাতাটার কথা বলছো?

জি স্যার। আজকেও কোরাস করে বললো রাজা ও ফারুক। সকলের আবুল ভাই বলে পরিচিত অধ্যাপক আজ আসেননি।

আমার কি মনে হচ্ছে জানো?

কি স্যার? রাজা বললো।

মনে হচ্ছে এই ছাত্রের সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ আছো।

রাগ করার কথা। তবু ফারুক হেসে উঠলো। সে নিজে একজন এক্সামিনার। তার কাছেও খাতা আসে। বললো, কস্মিনকালেও একজন এক্সামিনার জানতে পারেন না, চিনতে সক্ষম নন সংশ্লিষ্ট রোল নাম্বারের ছাত্রকে। পদ্ধতিটা এমনই যে, একজন উত্তরদাতা ও একজন পরীক্ষক কখনোই পরস্পরকে চেনেন না যদি না বড় রকমের দুর্নীতি হয়। এই খাতাটার ব্যাপারে আমাদের সুপারিশ হলো – *এক.* হস্তাক্ষর মুক্তমালার মতো সুন্দর, *দুই.* একটা বানানও ভুল নেই, *তিন.* খাতাটা ছিমছাম পরিপাটি, *চার.* প্রশ্নের চাহিদা মতো উত্তর প্রাঞ্জল ও যথাযথ এবং *পাচ.* নিজ যোগ্যতায় আমাদের মাপকাঠিতে লেটার নাম্বার ছুই ছুই করেছে। অতএব তাকে দুটো নাম্বার দান করলে বাংলার মতো বিষয়ে সে একটা রেকর্ড করতে পারবে। এতে তার জীবনের একটা মোড়ও ঘুরে যেতে পারে।

বক্তব্যের শেষাংশ পূরণ করলো রাজা। আরো একটা কথা আছে। বললো ফারুক।

বলো।

যে ছাত্র বাংলার মতো বিষয়ে আটাত্তর পেতে পারে সে অন্যান্য বিষয়েও ভালো করবে। হয়তো স্ট্যান্ড করবে। এমন একটা ছাত্রকে এগিয়ে দেয়া আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। বললো ফারুক।

তোমাদের দরদ আমাকেও উদ্বুদ্ধ করছে। কিন্তু এমন নাম্বার দিলে রি–এক্সামিন হতে পারে।

হোক। বললো রাজা। কথাকে আরো এগিয়ে নিল, তারা নাম্বার বাড়াক বা কমিয়ে দিক তাতে আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই।

বেশ, খুশি হলাম তোমাদের যুক্তিতে। খাতাটা তোমরাই নাও এবং ভালো করে পরখ করে নাম্বার দুটো দিয়ে দাও।

তারা দুজন খাতাটা নিল এবং উত্তরপত্রে দুটো স্থানে এক ও এক মোট দুটো নাম্বার যোগ করে দিল। খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় নাম্বার ফর্দে আশি নাম্বার লিখে দিল অংকে। ফারুক ও রাজার মনে হলো আট এবং শূন্য মিলে দুটো তারা হয়ে গেছে যা আকাশে জলছে জ্বল জ্বল করে।

তোমরা খুশি?

জি। অবশ্যই। আবারও বললো তারা।

এবারে আমাকে খুশি করো একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে।

বলেন স্যার। বললো ফারুক।

আশিকে লেটার মার্ক কেন বলে?

রাজা আমতা আমতা করলো। ফারুক বললো, পড়েছিলাম কোথাও। এখন মনে করতে পারছি না।

স্যার বললেন, এবারে একটা অংক কষো।

বলুন। বললো ফারুক।

আমরা ইংরেজি A-কে ১ ও Z–কে ২৬ ধরি। এবারে ইংরেজিতে লেটার লেখো। তারপর তাদের মান বসাও ও যোগ করো।

তারা তা করলো।

L E T T E R

12 5 20 20 5 18 = 80

দেখো আশি হয়েছে যোগফল। এভাবেই এটা একটা পুরস্কৃত নাম্বার।

বলা দরকার, রাজা ও ফারুক মামাতো–ফুপাতো ভাই। শেষবারের মতো এক সঙ্গে বললো –

থ্যাংক ইউ স্যার, অনেক অনেক ধন্যবাদ।

ঝিনেদা সরকারি কে.সি কলেজের রাজ্জাকস্যার আজ আর বেচে নেই। দীর্ঘ পনেরো ষোল বছর পারে রাজা ভাবছে, কে সেই ছাত্র যাকে বাংলায় আশি নাম্বার দিয়ে ভালোবেসেছিল তিনজনের একটা দল। সেই ছাত্রও জানে না এদের তিনজনকে যারা মাত্র দুটো নাম্বার এগিয়ে দিয়ে তাকে এবং নিজেদেরকেও গৌরবান্বিত করতে গলদঘর্ম হয়েছিল। এ এক মানসিক নিক্তির বিষয়।

২০০৪ সালের ভ্যালেনটাইনস ডে–তে রাজার কেন জানি সেই পুরনো বিষয়টা মনের কোণে উকি দিল যা ঘটনা, নয় কোনো কল্পকাহিনী।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে

ফুলেল দিন

– ফজলুল করিম খান

ভারত মহাসাগর আর প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে ঘেরা দ্বীপ মহাদেশ ভ্রমণ করার দারুণ ইচ্ছা হলো আমার। ভিসাও পেয়ে গেলাম মোটামুটি সহজেই। ছয় মাসের টুরিস্ট ভিসা নিয়ে সিংগাপুর এয়ারলাইন্সে রাত প্রায় বারোটার সময় ঢাকা ছাড়লাম। তখন সিংগাপুর সময় রাত দুইটা। সিংগাপুর সময় ভোর ছয়টায় সিংগাপুর এয়ারপোর্টে আমাদের প্লেন ল্যান্ড করবে। ইকনমি ক্লাসের রিটার্ন টিকেট ছিল আমার। জানালার পাশেই আমার সিট। স্বস্তি পেলাম। অবশ্য ঢাকা থেকে টিকেট নেয়ার সময়ই জানালার পাশের সিট চেয়ে নিয়েছিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বেল্ট বাধার নির্দেশ এলো। বেল্ট বেধে একটা ইংরেজি ম্যাগাজিনে চোখ বোলাতে লাগলাম। আমার পাশের অর্থাৎ ডানদিকে সিটে বসলো অস্ট্রেলিয়ান এক সুন্দরী। ভদ্রতাবশত তার দিকে ভালো করে তাকাইনি। কারণ, অপরিচিত কোনো যুবতী মেয়ের দিকে অপাঙ্গে তাকাতে আমার ভীষণ লজ্জা লাগে। এ জন্য সব জায়গায়ই মেয়েদের টিপ্পনি সহ্য করতে হয়। মেয়েটির শরীর থেকে যে দামি পারফিউমের গন্ধ ভুরভুর করে বের হচ্ছিল, তা উপভোগ করছিলাম। তার শরীরের গন্ধে আমি অভিভূত। দুজনে আলাপ–আলোচনা শুরু করলাম ইংরেজিতেই।

প্লেন ছাড়ার নির্দেশ হলো। বিরাটকায় বোয়িং বিমান যখন টেক অফ করছিল ঠিক তখনই এক অসতর্ক মুহূর্তে মেয়েটি আমার কাধের ওপর হেলে পড়ে।

সে ত্বরিত গতিতে সরে গিয়ে লাজুক হাসি হেসে বললো, এক্সকিউজ মি, আই অ্যাম সরি।

নো, নো। ইটস নাথিং। আই অ্যাম ওকে। হেসে বললাম আমি।

বিদেশিনী মধুর হাসি হেসে পরিচয় দিয়ে বললো, আই অ্যাম জেসিকা। অস্ট্রেলিয়ান। সিংগাপুর ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফিরছি। ইউ?

আই অ্যাম বাংলাদেশি। অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণে যাচ্ছি।

ভেরি গুড। আমার দেশে যাচ্ছো। তোমাকে সহযোগিতা করা আমার নৈতিক দায়িত্ব। কতো দিনের ভিসা পেয়েছো? তোমার নামটা বললে না তো?

সরি, আই অ্যাম ফজলু। ছয় মাসের ভিসা পেয়েছি।

কোন হোটেলে উঠবে সিদ্ধান্ত নিয়েছো?

সিডনি এয়ারপোর্টে নাকি ভালো হোটেল আছে?

তারচেয়ে বরং তুমি অপেরা হাউসের পাশে থাকো। সেখান থেকে যে কোনোদিকে যাবার জন্য বিভিন্ন যানবাহন আছে। ওখান থেকে তুমি পাবে স্টেট বাস, ফেরি, ট্রাম, পাতাল ট্রেন, মনোরেল। যেখানে ইচ্ছা খুব সহজে যাওয়া–আসা করতে পারবে, খরচও খুব কম হবে। আন্তরিক গলায় বললো জেসিকা। আরো বললো, আমার ড্যাডি গাড়ি নিয়ে আসবেন আমাকে নিয়ে যেতে। আমি তোমাকে অপেরা হাউসের কাছে হোটেলে তুলে দিয়ে যাবো।

অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। থ্যাংক ইউ ফর ইওর কাইন্ডনেস। বললাম।

ইটস মাই ডিউটি।

তখন সিংগাপুর এয়ারলাইন্সের বিমানমালা ট্রলি ঠেলে এক সিট থেকে অন্য সিটে ড্রিংকস সার্ভ করে এগিয়ে আসছিল। আমার কাছে এসে বিনয়ী গলায় বললো, আপনাকে কি দেবো স্যার?

আমি উত্তর দেয়ার আগেই জেসিকা বলে ফেললো, গিভ হিম বিয়ার। অ্যান্ড জিন অ্যান্ড টনিক ফর মি।

আদেশ মতো ড্রিংকস সার্ভ করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল সুন্দরী বিমানবালা।

সন্ধ্যা আটটায় আমাদের প্লেন সিডনি এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করলো। জেসিকা ও আমি বিমান থেকে নেমে চেকিং পয়েন্টে পাসপোর্ট দেখিয়ে চলে গেলাম কনভেয়ার বেল্টের কাছে। লাগেজ পিক করে চলে গেলাম লাগেজ চেকিং কাউন্টারে। তারপর ট্রলি ঠেলে গেটের বাইরে এলাম। জেসিকা–র ড্যাডি গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

পরিচয় পর্ব সমাপ্ত করে জেসিকা তার ড্যাডিকে বললো, ফজলুকে *সারকিউলার ভিউ*–এর হোটেলে তুলে দিয়ে যেতে হবে।

হাস্যোজ্জ্বল ড্যাডি ডেভিড ফিলিপস পাচ মিনিটের মধ্যে আমাকে আপন করে নিলেন। ধনাঢ্য ডেভিড ফিলিপস হাসিখুশি, অতিথি পরায়ণ মানুষ। আগামীকাল তার কোজি বিচের বাড়িতে আমাকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেই হবে এই অঙ্গীকার করিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

গাড়ি ড্রাইভ করছে জেসিকা। তখন সিডনি শহরে দিন না রাত বোঝা যাচ্ছিল না। আলোক উজ্জ্বল সৌন্দর্যের রানী সিডনি যেন রূপসী রাজকন্যার মতো হাসির মাধুরী মিশিয়ে পর্যটকদের হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। আমাকে আইবিস হোটেল পৌছে দিয়ে জেসিকা তার বাড়ির ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বারসহ কার্ড দিয়ে বিদায় নিল। বলে গেল, কাল দশটায় আসবো। আই উইল সি ইউ টুমরো এট টেন এএম।

পরদিন নাশতা সেরে *ডেইলি অস্ট্রেলিয়া*–য় চোখ বোলাচ্ছিলাম আর তখনি কলিংবেল বেজে উঠলো।

কাম ইন বলতেই দরজার পর্দা ঠেলে রুমে ঢুকলো জেসিকা। জিন্সের ট্রাউজার্স ও টি শার্ট পরা জেসিকা–কে অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল। সে সিগারেট খাচ্ছিল। আমাকে একটা সিগারেট অফার করে লাইটার দিয়ে ধরিয়ে দিয়ে ব্যস্ত গলায় বললো, চলো, আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি, দুপুরে আমার বাড়িতে লাঞ্চ করতে হবে।

দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। সে দুই এক দিন পর পরই নিজের পাজেরো দিয়ে আমাকে সিডনি ক্যানবেরা–র সকল নির্দশন ঘুরিয়ে দেখালো। ব্লু মাউন্টেন, পাম বিচ, মেনলি বিচ, এনটান্স, বন্ডাই, কোজি বিচ, সব পার্ক, পাতাল ট্রেন, মনোট্রেন, অলিম্পিক সিটি হোমবুস, ওল্ড সিডনি, পানির নিচ দিয়ে দুই কিলোমিটার টানেল, হারবার বৃজ, সমুদ্রের নিচে অতল তল পর্যন্ত অ্যাকুইরিয়াম, অদ্ভুত রকমের প্রমোদ তরী, রয়াল বোটানিকাল গার্ডেন, স্টার সিটি, কিংস ক্রস, সিডনি সি পোর্ট, সিডনি টাওয়ার, অপেরা হাউসে সঙ্গীত অনুষ্ঠান। অপেরা হাউসে নাটকও দেখেছি।

তারপর সিডনি থেকে সাত কিলোমিটার দূরে অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরা-য় সংসদ ভবন এবং সংসদ ভবনে মিটিংও দেখেছি দুঘণ্টা গ্যালারিতে বসে। এরপর যাই অস্ট্রেলিয়ার সায়েন্স কমপ্লেক্সে। সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল চাদের মাটি দেখা। নীল আর্মস্ট্রংয়ের আনীত একটা টুকরো পাথর সেখানে বুলেট প্রুফ গ্লাসের ভেতরে রাখা আছে। সেখানে বিশাল এন্টেনা অনেক উচুতে সেট করা আছে। সমস্ত পৃথিবীর খবর প্রতি সেকেন্ডে নেয়া হচ্ছে সেখানে। চাদের মাটির ছবি তুলে এনেছি। ক্যানবেরায় প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জাদুঘর এবং সাফারিতে চড়ে উন্মুক্ত চিড়িয়াখানা দেখেছি, মজা পেয়েছি। বনের ভেতর, পার্কে, চিড়িয়াখানায় ক্যাঙ্গারুদের অদ্ভুত দৌড়ঝাপ। যতো বিচিত্র প্রাণী রয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়।

অস্ট্রেলিয়াতে আঠারো বছর বয়স হলে ছেলেমেয়েরা নিজ নিজ ইচ্ছামতো সংসার গড়ে। জেসিকা-র দুর্ভাগ্য, তাকে দশ বছরের রেখে তার মা অন্য এক বয়ফ্রেন্ডের হাত ধরে এডিলেইডে চলে যায়। মেয়ের মায়ায় ডেভিড ফিলিপস দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। জেসিকা নিউ সাউথ ওয়েলস ইউনিভার্সিটিতে রাজনীতি নিয়ে পিএইচডি করছে। বেরিয়ে এসে সে রাজনীতিতে যোগ দেবে। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী হবার ইচ্ছে রাখে এই শক্ত মনের মেয়েটি।

দেখতে দেখতে ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস এসে গেল। ১৪ ফেব্রুয়ারি খুব ভোরে একশ গোলাপ ফুল দিয়ে তোড়া বানিয়ে নিয়ে এসে আমাকে উপহার দিয়ে চমকে দিল। বললো, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, টু ডে ইজ ভ্যালেনটাইনস ডে।

বেরিয়ে পড়লাম দুজনে। অস্ট্রেলিয়ায় ভ্যালেনটাইনস ডে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। এবং ভাষায় বর্ণনা করার ভাষাও নেই। সমগ্র সিডনির পথে পথে হাজার বয়ফ্রেন্ড ও গার্লফ্রেন্ডদের গোলাপ ফুলের তোড়া উপহার এক অনির্বচনীয় দৃশ্য। এ দৃশ্য দেখে আমি হতবাক। ফুলে ফুলে সারা সিডনি ফুলেল। শুধু যুবক-যুবতী নয়, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও তাদের আপনজনদের গোলাপ ফুলের তোড়া দিয়ে একেবারে গোলাপি করে দিচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায়, পার্কে পার্কে, ঘরের আঙ্গিনায়, গাড়িতে, সি বিচে কেবল ফুল আর ফুল, ফুলে ফুলে একাকার। এতো ফুল কোথা হতে এলো!

গাড়ি ড্রাইভ করতে করতে সিগারেট টানতে টানতে আমাকে জেসিকা বললো, ভ্যালেনটাইনস ডে-র জন্য, এই বিলাসী জাতির ভালোবাসা জানানোর জন্য সরকার প্রতি বছর অন্যান্য দেশ থেকে ফুল আমদানি করে। পঞ্চাশ থেকে ষাট টন গোলাপ ফুল আমদানি করে শুধু সিডনি শহরের জন্য। অন্য সাতটি প্রদেশেও আজকের দিনে একই দৃশ্যের অবতারণা হয়।

মনে মনে ভাবলাম, দারিদ্রপীড়িত দেশের লোকেরা যেখানে দুবেলা পেট ভরে ভাত থেকে পারে না সেখানে এই সকল ধনাঢ্য বিলাসী জাতি প্রিয়জনকে ফুল উপহার দিতে শ শ ডলার খরচ করে মনের আনন্দে।

হায়রে সৃষ্টির রহস্য! পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ, হত্যা, হাইজ্যাক, বোমা, অশান্তি, হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানির মধ্যেও যদি বাংলাদেশে অন্তত এমন একটা ফুলেল দিন পেতাম!

নারায়ণগঞ্জ থেকে

নাইটগার্ড

– নদী

জীবন তার আসল নাম নয়। ওটা ছিল আমার দেয়া ভালোবাসার উপহার।

ওর সঙ্গে আমার পরিচয় মিসকলের মাধ্যমে। প্রথম দিন কলব্যাক করে রূঢ় ভাষায় বলেছিলাম। সে রাগ করেনি। তবে মনের মধ্যে পুশে রেখেছিল। তারপর মেসেজ পাঠাতো। এক সময় তার মেসেজ যেন আমায় মোহাবিষ্ট করলো। একদিন লিখলাম Will you be my friend? তুমি কি আমার বন্ধু হবে?

প্রতিউত্তর পেলাম, I will be your friend forever। আমি চিরকালের জন্য তোমার বন্ধু হবো।
সে হয়তো কিছু না ভেবেই কথাটি লিখেছিল। কিন্তু আমার হৃদয়ে কথাটা লেখা হয়ে গেল অনন্ত কালের জন্য। তার কাছে যা ছিল শুধুই খেলা আর আমার জন্য হয়ে দাড়াল তা মরণ খেলা। এমন অবস্থা হলো, যে রাতে সে মেসেজ পাঠাতো না সে রাত আমার নির্ঘুম কাটতো।

এক সময়ে কথা হলো।

পরিচয় জানতে চাইলে সে বললো, আমি নাইটগার্ড।

জানি না তার কথায় কি জাদু ছিল! আমি ভালোবাসায় পাগল হয়ে গেলাম। কিছু না ভেবেই এ জীবনের সম্পূর্ণ অংশই তার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম। এই আধুনিক যুগেও একটি মাস্টার্স পড়া মেয়ে কিভাবে এই ছায়াহীন, কায়াহীন, ভালোবাসায় উম্মাদ হয়ে যায় তা ভাবলে নিজেও কম বিস্মিত হইনা।

ক্রমেই এমন অবস্থা হলো, আমার স্বাভাবিক জীবনযাত্রাই পদে পদে ব্যাহত হতে থাকলো। মনে হলো তাকে একবার না দেখতে পেলে হয়তো পাগল হয়ে যাবো। দেখা করতে চাইলাম। সে রাজি হলো।

দেখা হলো দীর্ঘ লঞ্চ যাত্রায়। আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রাত কাটালাম তার সান্নিধ্যে।

সেদিন আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম। আমার অনেক স্বপ্নের, অনেক কল্পনার, আমার ঘুম ভাঙানি জীবনকে কাছে পেয়ে অনেক অস্বাভাবিক আচরণ করছি। সে আদরে আদরে ভরিয়ে দিয়েছিল আমার সমস্ত অস্তিত্ব। যদিও সে অতিক্রম করেনি সীমা।

আমি পাচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি। পুরুষের স্পর্শই আমার কাছে মনে হতো অমার্জনীয় পাপ। অথচ তার কোনো কিছুই আমার কাছে সামান্যতম পাপ মনে হয়নি, আজও মনে হয় না। কেন হয় না এর ব্যাখ্যাও জানি না। ওই রাতটাকে আমার মনে হয়েছিল আমার বাসর রাত। আমার জীবনে যদি কোনোদিন বাসর রাত নাও আসে তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই। ওই একটি রাতের স্মৃতি বুকে নিয়েই বেচে থাকবো অনন্তকাল।

তারপরের কাহিনী অতি সংক্ষেপ। এরপর থেকেই হঠাৎ আমার জীবন বদলে যেতে শুরু করলো। বদলে যেতে যেতে এখন সে প্রায় সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। আমি ক্ষতবিক্ষত হতে হতে মৃত্যুর খুব কাছাকাছি এসে দাড়িয়েছি। মনে হয় মৃত্যু আর আমি পরম বন্ধুতে পরিণত হতে চলেছি। তার বন্ধুরা বলে ভুলে যেতে।

কিন্তু এতোদিন যে জীবন আমার বুকের আমার জীবনের এক অখণ্ড অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়েছিল, তাকে কেমন করে ভুলে যাবো? তাকে ভুলে যাওয়া মানে আমার অস্তিত্বকে ভুলে যাওয়া। আমি একাত্ম হয়েছিলাম। এই ভালোবাসার অনুভূতি বোঝানোর কোনো ভাষা আমার জানা নেই। তার অস্তিত্ব আমার রক্তের প্রতিটি কণিকায়। জানি না এতো যন্ত্রণা নিয়ে কতোদিন বেচে থাকবো।

তবে এখন একটু সান্ত্বনা, আমার জীবন আমার সঙ্গে আবার কথা বলে। অবশ্য নিজে কখনো কোনো ফোন করে না, আমি করলে রিসিভ করে। এটুকু দয়ার জন্য আমি আমার স্বপ্নের জীবনের কাছে অনেক অনেক অনেক কৃতজ্ঞ।

খুলনা থেকে

স্বর্গ

– শাহীন আক্তার

পাচ বছরের ছোট মিথিলা যখন কাদতে কাদতে বলে, মা, বাবাকে বলো একটা টিভি কিনতে। পাশের বাসায় টিভি দেখতে গেলে কেন তারা সোফা থেকে নেমে যেতে বলে? দুষ্টুমি করলে কেন টিভি বন্ধ করে দেয়? লাল–নীল–বেগুনি নাটক দেখতে দেয় না?

এতো প্রশ্নের উত্তর দিতে হিমশিম খেয়ে যাই। মেয়েকে এটা–সেটা বলে বুঝিয়ে বলি আর মাত্র কয়দিন পর আমরা টিভি কিনবো।

সেদিন যখন তাদের কাজের মেয়েটা আমার মেয়েকে দাবড়ালো তখন একদম সহ্য করতে পারিনি। পরদিন মেয়েকে নিয়ে মেয়ের বাবার অফিসে গেলাম। আমি জানি, এই মুহূর্তে একটা টিভি কেনা আমার স্বামীর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কারণ, সোনালী ব্যাংকের অফিসার স্বামী যে বেতন পায় তাতে সংসার চালাতে কয়েক রাতের ঘুম নষ্ট হয়।

তবুও মেয়ের কথা বলতেই আমার হাতে বেতনের পুরো টাকার একটা চেক দিয়ে বললো, সংসার চালাবে, না টিভি কিনবে সেটা তোমার সিদ্ধান্ত।

আমার অসীম সাহসে একটা টিভি কিনে ফেললাম অর্ধেক টাকা বাকিতে। আমি জানি, বাকি টাকা শোধ করতে আমার কতো কষ্ট হবে। কিন্তু ওই যে অসীম সাহস! যেমনটি সাহস দেখিয়েছিলাম আজ থেকে সাত বছর আগে মিথিলার বাবাকে বিয়ে করে। আমরা দুজনই তখন ছাত্র। কি কঠিন সময় তখন। ছাত্র অবস্থায় দুজন বাবা–মা হয়ে গেলাম। পাশের বাড়ির বড় ভাই যখন বর হয় তখন অবস্থা কেমন হয়?

আমার শ্বশুর প্রায় বলতেন, তোমরা এখনো ছাত্র, আর কয়েকদিন পর তোমাদের মেয়েও ছাত্রী হবে।

সেসব সময় কেটেছে আমার অনেক কষ্টের মাঝে। কিন্তু একটুও ঠকিনি।

আজ নিজেকে আমার পরিপূর্ণ মানুষ মনে হয়। কারণ, ভালোবেসে একজন নির্ভেজাল বন্ধু পেয়েছি। বিশাল একটা হৃদয় জয় করেছি, পেয়েছি নিশ্চিত একটা ঠিকানা। দু দুবার মা হতে পেরে ফুটফুটে দুটো বাচ্চা পেয়েছি যাদের মনে হয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ভালোবেসে অনাবিল সুখের সংসার পেয়েছি। একটানা সাত বছর প্রেম করে যাকে বিয়ে করেছি তাকে নিয়েই আমার এতো সব।

প্রেম করে বিয়ে করলে যে সমস্যাগুলো হয়, আমারও তার থেকে বেশি ছাড়া কম হয়নি। অনেক উত্থান–পতন, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, পারিবারিক অশান্তি, আত্মীয়–অনাত্মীয়ের বাকা দৃষ্টি সব ছিল। এতোসব যন্ত্রণার মাঝেও আমি ছিলাম ভীষণ সুখী। আমার সুখ পাওয়ার আয়োজন খুবই কম, কিন্তু সুখের প্রাপ্তি অনেক। একটা টিভি কিনতে পেরে মানুষ কতোটা সুখী হয় তা আমার সন্তান ও আমার স্বামীর মুখ দেখে উপলব্ধি করেছি।

এখন মেয়ে আর তার বাবা একই লেপের নিচে শুয়ে টিভি দেখে। খাটের ওপর উঠে ইচ্ছেমতো লাফায়। আমি যদি একটু রাগ হই তাহলে মেয়ে তার বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, বাবা, এটা তো নিজের টিভি, নিজের ঘরে বসে দুষ্টুমি করলে, টিভি দেখলে কেউ কি বকা দেয়?

তার বাবা হাসে। আমি তাকিয়ে হাসি আর মনে মনে বলি, এ সুখের নেই কোনো সীমানা। আমার ছেলে মোহিত, দশ মাস বয়স। সে যখন টিভির বিজ্ঞাপনের দিকে তাকিয়ে খিলখিলিয়ে হাসে তখন সশব্দে উচ্চারণ করি, আমার এ ঘর যেন স্বর্গ।

আমার মেয়ে ফিক করে হেসে দিয়ে বলে, ওমা, তোমার তো রেফ্রিজারেটর নেই, সোফা নেই, তাহলে তোমার ঘর কিসের স্বর্গ?

আমার মনে পড়ে যায় *সত্য–মিথ্যা* ছবির গানের কথা, *ওমা কেমন তোমার স্বর্গ, কলে পানি নাই...।*

গণনা করে দেখলাম, বিয়ের অনেকটা বছর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু সংসার জীবন অল্প দিনের। তাই একটা মাত্র খাট ছিল আমার বাসায়। আমার মেয়ে সব সময় বলতো, আরেকটা খাট কিনো মা।

আরেকটা খাট কিনলাম। অথচ শোয়ার কষ্ট আমার আগের মতোই। আমি যেখানে ঘুমাই, সবাই সেখানে। একটা খাট আমার খালি পড়ে থাকে। চারজন মানুষ একটা ঘাটে ঘুমাতে কষ্ট হয়। তবুও কেউ কাউকে ছেড়ে যাবে না।

আমি জানি, আমাদের সমাজে মেয়েরা ভালোবেসে সুখী হতে পারে না। কেন পারে না জানি না। শুধু এটুকু জানি, *ত্যাগেই প্রকৃত সুখ।*

আমার স্বামী আমাকে বলে, তুমি তো আমাদের বটগাছ।

সৃষ্টিকর্তার কাছে শুকরিয়া আদায় করি, খোদা, আমি এর বেশি কিছু চাই না। আমার যা আছে আমি তাতে সুখী, ভীষণ সুখী।

নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ থেকে

নোনা জলে

– সোহেল

কোনো এক বইতে পড়েছিলাম, ভাসমান মানুষের সব কিছুই কম থাকা ভালো। তাহলে ভাসতে কষ্ট হয় না। জীবনকে উচু পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেই এসএসসি পাস করার পরই নিরন্তর চেষ্টা। হ্যা আজ আমি একজন প্রতিষ্ঠিত মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। একদিন যে স্বপ্ন দেখতাম মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হবো সেটা আজ আমার বাস্তবতা। এই ভালোবাসা দিবসে লিখবো না কোনো নারী হৃদয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবার কথা। উনত্রিশ বছর বয়সের এই জীবনে অনেক মেয়েকেই বন্ধু হিসেবে দেখেছি যাদের শতকরা নিরানব্বই ভাগই স্বার্থপর। তাই এসব স্বার্থপর আর লোভী মেয়েদের নিয়ে লেখার ইচ্ছা নেই।

একজন মেরিনার হওয়ার সুবাদে বহু দেশ ঘোরার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। তার মধ্যে একটা হলো সিয়েরা লিওন। ২০০১ সালের জুন মাসের ২১ তারিখ আমাদের জাহাজ নিয়ে ফৃ টাউনে পৌছি। আমার ওই জাহাজটা ছিল পাকিস্তানি মালিকানাধীন। আমরা চার পাচজন ছাড়া সবাই পাকিস্তানের ছিল।

জাহাজ বার্থ করার পর একজন ওয়াচম্যানকে ডেকে বললাম এখানে তো বাংলাদেশি আর্মি আছে তাই না, সম্ভব হলে কাউকে ডেকে নিয়ে এসো।

তখন ওয়াচম্যান জেটির বাইরে থেকে একজন বাংলাদেশি মেজরকে খবর দিল এবং মেজর সাহেবও জাহাজে এলেন। তার নাম মনে না থাকলেও বাড়ি ছিল ফেনীতে।

এমনি করে প্রতিদিনই নতুন নতুন আর্মি অফিসারদের সঙ্গে পরিচিত হলাম। তখন খুব গর্ব বোধ করছিলাম এই ভেবে যে, আমার দেশের সৈনিকরা এখানে কতো না সমাদৃত। সিয়েরা লিওন থেকে বাংলাদেশে ফোন করা খরচ সাপেক্ষ। তাই একদিন দ্বারস্থ হলাম আমার সেই সৈনিকভাইদের কাছে।

তারা আমাকে বললো তাদের হেড অফিস *হোটেল মামিকো*–তে গিয়ে অবজারভেশনে মেজর হারুন সাহেবকে বলতে।

হাজির হলাম সেখানে। তখন অবশ্য মেজর হারুন সাহেব ছিলেন না। অন্য একজন মেজরের সাহায্যে দেশে ফোন করলাম। কিন্তু তিনি কোনো পয়সাই নিলেন না।

সেদিন বিকেলবেলা সেই মেজর সাহেব ও মেজর মনির এবং অন্য একজন ক্যাপটেন আমাদের জাহাজে এলেন। বেশ খানিকটা সময় ভালোই কাটলো তাদের সঙ্গে।

তার পরদিন গেলাম হেসটিংয়ে যেখানে বাংলাদেশের এক নাম্বার ক্যাম্প ছিল। আমি যখন সেখানে বললাম বাংলাদেশ থেকে এসেছি তখন সেখানকার সবাই অবাক হচ্ছিলেন এই আফৃকার বন–জঙ্গলে একজন সিভিল পারসন! আধা ঘণ্টার মধ্যেই আরো বন্ধুত্ব হয়ে গেল সবার সঙ্গে এবং সবাই ব্যস্ত হলেন আমায় আপ্যায়ন করতে। তখনি দেখা হলো দাউদকান্দির মজিবভাইয়ের সঙ্গে। তিনি আমার বাড়ির পাশের হওয়ায় আনন্দ আর বাকি রইলো না। এভাবে বিশ দিন খুব আনন্দের সঙ্গেই কাটলো। কিন্তু সিয়েরা লিওন–এ কর্মরত আর্মিদের প্রতি ভালোবাসা আমার মনেই গেথে রইলো।

গত ২৫ ডিসেম্বর ২০০৩ তারিখে বেনিন–এ বিমান দুর্ঘটনায় নিহত সৈনিকদের লাশ যখন জিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নামানো হচ্ছিল তখন আর দশজনের মতো আমিও চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। এতোই কষ্ট লাগছিল যা আমার স্বার্থান্বেষী প্রেমিকার দেয়া ব্যথার চেয়েও হাজারগুণ বেশি। তাই আজ এই ভালোবাসা দিবসে সেসব নিহত সৈনিকদের প্রতি রইলো শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা। আল্লাহ যেন সবাইকে বেহেশত দান করে।

গৌরীপুর, কুমিল্লা থেকে

অন্বেষণ

ভালোবাসা দিবসের বিশেষ সংখ্যায় ভেবেছিলাম একটি সুন্দর ভালোবাসার গল্প লিখবো। কিন্তু ভালোবাসাহীন এ জীবনে ভালোবাসার ভাব উদয় হয়েই কল্পনার জগতে *হাওয়াই মিঠাই*–এর মতো মিলিয়ে যায়। জীবনের রূপ রস উপভোগ করার জন্য তার স্থায়িত্ব থাকে না।

প্রথমেই ক্ষমা চাচ্ছি সেসব পাঠকদের কাছে যারা এতোক্ষণ বিভিন্ন ভালোবাসার গল্প, ঘটনা পড়ে আবেগ আপ্লুত হয়ে হঠাৎ করে আমার এ সঙ্গতিহীন প্রয়াস দেখে ভ্রূ কুচকে ফেলছেন।

অনেকে বলবেন, *ভালোবাসা* সংখ্যায় আবার দুঃখের সাতকাহন কেন?

আমি এমন এক পরিবারের সন্তান যে পরিবারে জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখছি বাবা–মায়ের মধ্যে অসম সম্পর্ক। আমার বাবা–মা যাদের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিল বেশি। ভালোবাসার চেয়ে মানিয়ে চলার অভিনয়ের প্রচেষ্টা বেশি। মমতাপূর্ণ সম্পর্কের চেয়ে নিজেদের অহংবোধ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

আমি জানি, অনেকে হয়তো বলবেন, বাবা–মায়ের মধ্যে সম্পর্কের অনেক তারতম্য থাকে। সেগুলো মানিয়ে নিয়ে চলাই প্রত্যেক শিক্ষিত সন্তানের চেষ্টা হওয়া দরকার।

কিন্তু মানসিক শান্তিই যদি না থাকে তাহলে সে ঘর কি ঘর থাকে। সেটা হয়ে ওঠে ইট–কাঠের একটি কাঠামো যে কাঠামোর ভেতর শুধু দিনাতিপাত করা যায়।

আমার প্যারেন্টসের বয়সের ব্যবধান, নাকি অন্য কোনো কারণে তাদের দীর্ঘ সময় মানসিক দিক থেকে যোজন যোজন দূরে সরিয়ে রেখেছে তা আমি অনেক খোজার চেষ্টা করেছি। হয়তো অনেক জবাব পেয়েছি। কিন্তু কোনোটাই আমার সমস্যার স্থায়ী সমাধান দিতে পারেনি।

আমার বাবা, বাবা কম, জন্মদাতা বেশি। শুনেছি আমার জন্মের পর তিনি খুশি হননি। বংশরক্ষার প্রদীপ জন্ম না দিতে পারার অপরাধে আমার মাকে যথাসম্ভব মানসিক অত্যাচারে জর্জরিত করা যায় তার কোনো কার্পণ্য তিনি করেননি। পর পর দুটি মেয়ের পর যখন একটি ছেলে আমার মা তাকে দিতে পেরেছিলেন তখন তিনি শান্ত হন।

আমার বাবাকে সব সময় দেখেছি অস্থির, রগচটা, Foul words uttering person হিসেবে। নিজেকে ছাড়া তিনি অন্য কাউকে নিয়ে বিচলিত নন।

আমার নানাবাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক সব সময় বিরোধপূর্ণ। বড় জামাই হিসেবে তিনি যে আদর, সম্মান আমার নানা–নানির কাছ থেকে পেয়েছেন তা স্বীকার করতে হয়তো তার অহং–এ বাধে। আমার মা এমন এক রমণী যিনি আমার বাবার সব মেন্টাল টর্চার মেনে নিয়ে জীবনের এতোগুলো সময় কাটিয়ে দিয়েছেন এবং সামনেও দেবেন।

তাদের দুজনের মধ্যে মানসিক ব্যবধান যে ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারে তা তারা কখনো মানতে চাননি এবং এখনো চান না। আমার মায়ের ধারণা, মেয়েরা নিজের পায়ে দাড়ালেই শুধু স্বামীর কাছ হতে সম্মান পাওয়া যায়। তিনি হয়তো তার নিজের জীবন থেকে এ শিক্ষা পেয়েছেন।

সব সময় দেখেছি আমার মা যা বলতেন, বাবা তার উল্টো করতেন। তাদের এ জেদের বেশে আমাদের পরিবারটা এলোমেলো।

আমাদের তিন ভাইবোনের জীবন আরো সুন্দর হতে পারতো যা আমার বাবার জন্য হয়নি।

মানুষের জীবনে যেটার অভাব তীব্র তার জন্যই সে সব সময় ব্যগ্র থাকে। তাই আমরা তিন ভাইবোন সব সময় ভালোবাসার কাঙাল।

Every family is a school. What a man learns from this school reflects on his practical life. আর এ স্কুল থেকে আমরা শিখেছি ভালোবাসাহীন, আবেগহীন হয়ে বেড়ে ওঠার শিক্ষা। এমন একটি ভালোবাসাহীন পরিবারের বেড়ে ওঠার ফলে আমাদের মধ্যে সব আবেগ হয়তো মরে যাবে। আমরা শারীরিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে সবল হয়েও হয়তো মানসিক দিক থেকে পঙ্গু হয়ে থাকবো। জানি না এর ফল কি হবে! এবং এর জন্য দায়ীই বা কে হবে?

আমার পরিবারের সবাই খুব রিয়ালিস্টিক বা বাস্তববাদী। হয়তো মা বাবাকে দেখে আমরা এ শিক্ষা পেয়েছি। ভালোবাসা দিয়ে যুদ্ধ জয় হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু যুদ্ধের সৃষ্টির পেছনে যে হিংসা, দ্বেষ কাজ করে তা তো রোধ করা সম্ভব! আমার মায়ের ধারণা, ভালোবাসা মানুষকে অতিরিক্ত ইমোশোনাল করে যার ফলে মানুষ ভুল পথে দ্রুত ধাবিত হয়। আমার মা হয়তো তার দীর্ঘ জীবনে বিভিন্ন ঘটনা থেকে এ ধারণা পেয়েছেন। কিন্তু ভালোবাসা মানুষকে জীবনের, খ্যাতির, সাফল্যের শীর্ষেও আসীন করতে পারে তা তিনি ভুলে যান। হয়তো জীবনের কর্কশ বাস্তবতা তাকে প্রেম, মমতা, ভালোবাসার স্বর্গীয় রূপ দেখতে দেয়নি।

একতরফা মাকে দোষ দিই না। আমার বাবা আমার মায়ের জীবনের যে অবলম্বন, ভরসা হতে পারতেন তা তিনি পাশ কাটিয়ে গেছেন বরাবরই। আমার মা যে ভালোবাসা পূর্ণ সম্পর্ক বাবার কাছ থেকে আশা করেছিলেন তা তিনি কখনোই পাননি।

এতো উত্থান-পতন, এতো কঠিন বাস্তবতার রূঢ় কষাঘাত, এতো বঞ্চনা। তারপরও আমার বাবা-মা কোনো এক ক্লান্ত দুপরে অতীতের কোনো সুন্দর ঘটনা স্মৃতিচারণ করে হেসে ওঠেন এবং একে অপরের সঙ্গে খুনসুটিতে মেতে উঠেন। তখন অনেক বৃষ্টির পর রঙধনুর মতো ক্ষণস্থায়ী হলেও মনে হয় সত্যিই ভালোবাসা আমাদের সংসারে স্বল্প স্থায়ী হলেও একেবারে হারিয়ে যায়নি।

ভালোবাসা আমাদের পরিবারের ডালপালা মেলে মহীরুহ হয়ে উঠতে পারেনি সত্যি। কিন্তু চারাগাছে হয়তো উকিঝুকি মারছে। সে চারাগাছকে পরিচর্যা করে, বিশাল বৃক্ষে পরিণত করে তার সুফল পরিবারের সবার মধ্যে আমার পিতা-মাতা পৌছে দিতে ব্যর্থ সত্যি। তবে তাদের যে কোনো আশা ছিল না তা হয়তো অস্বীকার করা ঠিক হবে না।

আমার পরিবারকে আমি ভালোবাসি। এ ভালোবাসা স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার মতো কামনা-বাসনা পূর্ণ নয়, পিতা-পুত্রের ভালোবাসার মতো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নয়, মাতা-পুত্রের সম্পর্কের মতো আত্মকেন্দ্রিক, একচোখা নয় – এ ভালোবাসা নির্মল, স্বাস্থ্যবান, স্বার্থহীন। আমি চাই সব পরিবারের মধ্যে এ ভালোবাসা বহমান হোক যাতে করে আমার মতো আর কেউ ভালোবাসার জন্য কাঙাল হয়ে দুঃখের বোঝা না টানে। কারণ –

ভালোবাসা ছাড়া আর আছে কি?

ভালোবাসা হলো নিঃশ্বাস এ দেহের

নিঃশ্বাস ছাড়া মানুষ কখনো বাচে কি?

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

ম্যাঙ্গো ট্র- র নিচে

মেডিকালে ফোর্থ ইয়ারে ক্যান্সারে (Lymphoma) আক্রান্ত হই। ত্বরিত চিকিৎসার জন্য বম্বে-র *টাটা* হাসপাতালে যাই। সেখানে তিন মাস যন্ত্রণাদায়ক চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরে আসি। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সবাই আসতো, সহানুভূতি প্রকাশ করতো। সকলে চলে গেলে হাতে থাকতো অফুরন্ত অবসর। চেয়ার নিয়ে বারান্দায় অথবা ঘরের সামনে ছোট্ট আমগাছের ছায়ায় বসে দৈনিক পত্রিকা, যায়যায়দিন, রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব গুহ এসব ছিল একঘেয়ে অবসরের নিত্যসঙ্গী। চলনশক্তি বারান্দা টু ম্যাংগো ট্র-র মধ্যে সীমিত।

সে ছিল পাশের বাসার সেভেন পড়ুয়া কিশোরী। মিষ্টি, শ্যামলা, চঞ্চল, সদাহাস্য। তাদের বাসায় খোলা জায়গা না থাকায় সকাল-বিকাল আমার মাঠে চেয়ারের আশপাশে দৌড়াদৌড়ি এ ছিল নিত্যঘটনা। দৌড়াদৌড়িতে এক সময় ক্লান্ত হলে আমার পাশে আসতো। বলতো, ডাক্তারভাই কি করো?

বই বন্ধ করে জুড়ে দিতাম গল্প।

মাঝে মধ্যে সে বাটিতে করে নিয়ে আসতো নাশতা, তরকারি। বলতো, ডাক্তারভাই, সারা দিন বসে থাকো, আম্মা পাঠিয়েছেন তোমার জন্য।

সে এলে গল্প করতে ভালো লাগতো। রোগের দুশ্চিন্তা কমে যেতো। এরই মধ্যে কয়েক বছর কেটে গেল। তিল তিল করে শারীরিক উন্নতি লাভ করি। আস্তে আস্তে হাটাচলার শক্তি ফিরে পাই। মাঝে মধ্যে তাদের বাসায়ও যাই। গল্পের আসর বসতো তাদের বারান্দায়। গাছের নিচে বসে পড়ি। এ জন্য আমার নাম হয়ে গেল ম্যাংগো ট্র।

দেখতে দেখতে সে বড় হয়ে গেল। এইট, নাইন পাস করে এসএসসি দেবে। অবসর থাকায় তার পড়াশোনার খোজখবর নিতাম।

প্রতি বছর একবার টাটা-তে চেকআপ-এ যাই। পাচ বছর পর ডাক্তার চূড়ান্ত নিরাময়ের সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেন, আর বছর বছর চেকআপের প্রয়োজন নেই।

অফুরন্ত অবসর। সারা দিন বাসায় থাকি, বই পড়ি। পড়ালেখা তো ছেড়ে দিলাম। ছোটখাটো ব্যবসার চিন্তা করি।

ম্যাংগো ট্র-র নিচে একদিন বই পড়ছি।

সে এসে জিজ্ঞাসা করে, ডাক্তারভাই, কি পড়?

বই পড়ি।

সেই তো পড়তে পারো। তো তোমার বই পড় না কেন?

বলি, আমার বই কি?

কেন ডাক্তারি বই!

বললাম, না রে। ডাক্তারি কঠিন পড়া, সে আর পারবো না।

না। তুমি পারবে।

চমকে উঠি। তাই তো। কেন পারবো না? হোক না লেট। Better late than never. বেটার লেট দ্যান নেভার।

ডাক্তারি থেকে অনেক দূর সরে এসেছিলাম। তার এ প্রেরণায় আবার মেডিকালে পুনঃভর্তির আবেদন করি। অনেক জটিলতা সেরে ছয় বছর পর ফোর্থ ইয়ারের পুনঃভর্তির অনুমতি পাই। নতুন অচেনা সহপাঠীদের সঙ্গে নিয়মিত ক্লাস করি। সে যে কি কষ্টের, মাঝে মধ্যে কান্না আসতো। তবুও সহপাঠীদের সঙ্গে সহজ হওয়ার চেষ্টা করি। অবশেষে ফোর্থ ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ফিফথ ইয়ারে প্রমোশন পাই। এবার যেন

আর থামতে ইচ্ছা হলো না। পুরোপুরি মনোযোগী হয়ে ফিফথ ইয়ারে নিয়মিত ক্লাস করি। সামনে ফাইনাল পরীক্ষা।

এদিকে সেও এসএসসি পরীক্ষা দেবে। কিন্তু কেন জানি পরীক্ষায় ফেল করলো। বাসায় এসে খুবই কান্নাকাটি।

খবর পেয়ে গেলাম। মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলাম।

সে আমার হাত ধরে আরো বেশি কান্নাকাটি করতে লাগলো। আবার পরীক্ষা দেয়ার জন্য পরামর্শ দিলাম। কিন্তু তার এক সিদ্ধান্ত, সে আর পড়বে না।

কয়েক মাস পর একদিন তার বাবা খবর দিলেন।

গেলাম।

বললেন , দেখো বাবা, সে তো আর পড়াশোনা করবে না। আমি বৃদ্ধ মানুষ, আমার ছেলেরাও দেশে নেই। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তাকে বিয়ে দিয়ে দেবো। আজ ছেলের পক্ষের লোকজন দেখতে আসবে। তুমি একটু বিকেলবেলা এসো।

তিনি আমাকে ছেলের মতো নির্ভর করতেন। বললাম, ঠিক আছে আসবো।

গেলাম। মেয়ে পক্ষের প্রতিনিধি হয়ে আলোচনায় অংশ নিলাম। ছেলে পক্ষের মেয়ে পছন্দ হলো। দুই মাস পরে ছেলে লন্ডন থেকে এলো। ছেলে দেখতেও গেলাম। ছেলে এসেও মেয়ে পছন্দ করে গেল। দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেল। আমি ছিলাম মেয়ে পক্ষের অন্যতম নীতি–নির্ধারক।

ওই দিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ সে আমাকে ফোন করলো। বললো – ডাক্তারভাই, দিনক্ষণ তো ঠিক হয়ে গেল।

জানি। আমিই তো ঠিক করলাম।

তুমি কি বোঝো না?

কি?

আমি যে তোমাকে ভালোবাসি!

বলিস কি? মনে হলো যেন আকাশ ভেঙে পড়ছে।

আমার চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে। অনুভব করলাম আমারও তো তাকে ভালো লাগে। বলতে চাইলাম, আমিও তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু বলিনি। কারণ, তার এবং আমার মধ্যে বয়সের বিস্তর ফারাক। তবুও আমি এক ক্যান্সার রোগী। সে এক কিশোরী মেয়ে। কিভাবে এটা মেনে নেবে। তাই আর এদিকে যাইনি।

মুখে বললাম, আগে কেন বলিসনি?

আমার ভয় করে, আমি কি আর তুমি কি?

তুই কি জানিস আমার বয়স?

জানি। একশ বছর হয়নি।

তুই কি জানিস আমি হঠাৎ মরে যেতে পারি?

আমার একটি দিন পেলে চলতো। তাছাড়া তুমি তো সুস্থ হয়ে গেছো।

এই অনুভূতি কতোদিনের?

ছোটবেলা থেকে তোমাকে আমার ভালো লাগে। আজ চার বছর।

এখন ফোন করলি কেন?

আমি জানি না।

বিয়ের আর চার দিন বাকি। আমিই কারিগর। এদিকে তার বৃদ্ধ বাবা। আমার ওপর অগাধ বিশ্বাস। আত্মীয়স্বজন জানাজানি হয়ে গেছে। বললাম, আল্লাহর ইচ্ছা না মেনে এখন আর উপায় নেই।

বিয়ে হয়ে গেল।

স্বামীর বাড়ি থেকে ফেরত এসেই ফোন করে আমাকে দেখা করতে বললো। পরদিন বাইরে দেখা করলাম। কান্নাকাটি করতে লাগলো। এও জানিয়ে দিল, ছেলেকে তার ভালো লাগে না।

মাস খানেক পর ছেলে লন্ডন চলে গেল। সে বাবার বাসায় রয়ে গেল। এদিকে ফোন যোগাযোগ এবং বাইরে দেখা–সাক্ষাৎ বেড়ে গেল। প্রতি রাত দুই তিন ঘণ্টা আলাপ চলতো।

ঘনিষ্ঠতা চূড়ান্ত রূপ নিল। নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। তাদের ঘরেও জানাজানি হয়ে গেল। স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

সুযোগ পেলেই সে আমার কাছে চলে আসতো, জড়িয়ে ধরতো। আদর–সোহাগে পরিপূর্ণ করে দিতো।

এভাবে বছর, দিন চললো। দেখলাম, তার ভালোবাসার তীব্রতার কাছে পৃথিবীর সকল প্রেম কাহিনী তুচ্ছ।

একদিন বললাম, আমার পড়াশোনা করতে ইচ্ছা করে না।

কেন?

ভালো লাগে না।

সে অস্থির হয়ে উঠলো। টেলিফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাকে উল্টো বোঝাতে লাগলো। শপথ আদায় করে ছাড়লো। বললো, তুমি কোনো দুশ্চিন্তা না করে পড়াশোনা করো। বারান্দায় অথবা গাছের নিচে চেয়ার–টেবিল নিয়ে সারা দিন পড়বে। আমি সরাসরি তোমার সামনে আমাদের ব্যালকনিতে থাকবো। বই থেকে চোখ তুলতেই আমাকে দেখতে পাবে।

আমি সারা দিন বারান্দায় বসে ফাইনাল পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতাম আর সে তার ব্যালকনিতে দাড়ানো থাকতো। চোখ তুললেই একটি মিষ্টি হাসি দিতো।

ফাইনাল পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে কলেজে যাবো। সে ডাক দিল। বললো, তোমার পরীক্ষার ফি কতো?

নয়শ টাকা।

দাড়াও। বলে ঘর থেকে পাচশ টাকার দুটি নোট হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো, আমার টাকা দিয়ে পরীক্ষার ফি দেবে। আমার দোয়ায় তুমি পাস করবে।

কোনো কথা না বলে টাকাটা নিয়ে পরীক্ষার ফি দিতে গেলাম। পরীক্ষার রুটিন পেলাম। ইতিমধ্যে হঠাৎ তার স্বামী লন্ডন থেকে ফেরত এলো। তাকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যেতে চাইলো। সে যাবে না। আমার পরীক্ষার পনেরো দিন বাকি। সে চলে গেলে আমার পরীক্ষা খারাপ হয়ে যাবে অথবা আমি পরীক্ষা না দিতে পারি। তাই সে নানান অজুহাতে থেকে যায় আমার পরীক্ষা পর্যন্ত।

বলা সঙ্গত, ডাক্তার হওয়ার জন্য আমার পরিবারের কোনো চাপ ছিল না। আমার বৃদ্ধ মায়ের কথা, আল্লাহ হায়াত দিলেই হলো। আমার ডাক্তার হওয়ার দরকার নেই।

কিন্তু আজ আমি ডাক্তার। রোগী এবং রোগ নিয়ে হাসপাতালে সারা দিন থাকি। ইন্টার্নি করছি। কিন্তু আক্ষেপ, সে দেখে যেতে পারেনি তার ডাক্তারভাই সত্যি ডাক্তার হয়েছে। রেজাল্ট হওয়ার এক সপ্তাহ আগে সে লন্ডন চলে যায়। চলে যেতে বাধ্য হয়।

আজ অবসরে ম্যাংগো ট্রি–র নিচে বসে ব্যালকনিতে তার ছায়া খুজি আর ভাবি, আমার এ ভাঙাচোরা জীবনে তার খুব প্রয়োজন ছিল, যে আমার সকল দুর্বলতা জেনেও শুধুই আমাকে ভালোবাসতো। তিলে তিলে অনুভব করতো। আমার সকল চাওয়া–পাওয়া বুঝতো। আমাকে সফলতা এনে দিল। ডাক্তারের পরিচয় দিল। সে যে বড় বেশি বেশি করে আমার ছিল। এমন আর পাবো কই?

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

সেন্ট মার্টিনসে

– সাবিনা হাসান

ভাইয়ার চাকরির সুবাদে তখন আমরা সেন্ট মার্টিনস দ্বীপে থাকতাম। বাবা মারা যাবার পর ঢাকার বাড়িটা ছেড়ে আমরা এই দ্বীপে চলে আসি। দ্বীপটা যে কি অসাধারণ তা এই স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমি আর আমার ছোট বোন সারাটা দিন পূব দ্বীপ ঘুরে বেড়াতাম। সবার সঙ্গে পরিচিত হওয়াটা ছিল প্রধান কাজ। দুদিনেই দ্বীপবাসীরা আমার বন্ধু হয়ে গেল। ফলে পাড়া বেড়ানো স্বভাবে দাড়ালো।

এই দ্বীপের একটা লক্ষণীয় বিষয় হলো, এখানে রাত–দিন অবাধে চলাফেরা করা যায়– ছিনতাইকারীর ভয় নেই, নেই লাঞ্ছিত হওয়ার সম্ভাবনা। রাত–দিন এই দ্বীপে অনেক টুরিস্ট আসা–যাওয়া করে। তাদের দ্বীপ সম্পর্কে নানান তথ্য দেয়া ছিল আমার কাজের মধ্যে একটি।

আমরা থাকতাম কোনাপাড়া নামে এক স্থানে।

একদিন মসজিদ *শিলা* থেকে বাসায় ফিরছিলাম। পথে দেখি একটা সুদর্শন যুবক নালার সামনে দাড়িয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে অস্বাভাবিকভাবে কি যেন খুজছে।

এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কোনো সমস্যা হয়েছে কি না।

আমাকে দেখে এমন ভাব করলেন যেন আমার জন্য আকুল হয়ে ছিলেন।

তার কথা শুনে দুঃখ হলেও হাসিও পাচ্ছিল বেশ।

নালার মধ্যে চকচক করছে কি সেটা দেখার জন্য যেই না নিচু হলেন অমনি চশমাটা খুলে স্রোতে ভেসে গেল। চশমা ছাড়া একা পথ চলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি থাকতেন *বে অফ বেঙ্গল লজ* হোটেলে। তাকে সেখানে পৌছে দিলাম এবং তার বন্ধুত্ব গ্রহণ করলাম।

তার নাম মিজান, থাকেন লন্ডনে। পনেরো দিনের জন্য সেন্ট মার্টিনস দ্বীপে এসেছেন। তিন দিন চলে গেছে, বাকি দিনগুলো তাকে পুরো দ্বীপে ঘুরে দেখলাম এবং সব চেনালাম। পুরো দ্বীপ আমার নখদপর্ণে।

প্রচুর কথা বলতে বলতে হাসা আমার স্বভাব। তাই পাকা গাইডের ভাব ধরতে কোনো কষ্টই হলো না। ভাইয়া দ্বীপ সম্পর্কে একটা গবেষণামূলক বই লিখেছেন *প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনস*। সেই বইটা তাকে উপহার দিলাম দ্বীপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য।

আমরা মাঝে মধ্যে *কেয়া* বনে বসে গল্প করতাম। সেখানে বসলে প্রায়ই আমার ওড়না কেয়া গাছের কাটায় জড়িয়ে গেলে মিজান খুলে দিতো। একদিন ওড়না ছড়াতে গিয়ে তার হাতটাই কেটে গেল। তখন তার হাতটা ব্যান্ডেজ করে দিয়েছিলাম।

সন্ধ্যার পর বালির ওপর বসে সমুদ্রের গর্জন শুনতে শুনতে চাদ দেখা বিলাসিতা ছিল। এমনই একদিন তাকে বলেছিলাম, যতোদিন আমাদের আবার দেখা না হচ্ছে। ততোদিন শুধু চাদের সঙ্গে কথা বলে একে অন্যকে স্মরণ করবো।

নিমেষেই বারোটা দিন পার হয়ে গেল। দুজনই বিষাদ মনে দুজনকে বিদায় জানালাম। কথা হলো লন্ডন ফিরে গিয়ে মিজানই প্রথম যোগাযোগ করবে।

এরই মাঝে কেটে গেল কয়েক মাস। সব কিছুই আবছা প্রায়। আমরা ঢাকার বাড়িটাতে ফিরে এলাম।

বিএ পাসের পর পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়ে গেল আমার। সংসারের প্রচণ্ড ব্যস্ততায় জড়িয়ে গেলাম। ফুপুশাশুড়ি অসুস্থ হয়ে ক্লিনিকে ভর্তি হলেন। তাকে দেখাশোনা করতে প্রতিদিনই আমাকে ক্লিনিকে যেতে হতো, সঙ্গে থাকতো তিন বছরের ছোট মেয়ে সামিরা। ভীষণ দুষ্টু। লনের ফুল ছিড়ে হাত কেটে একাকার করে ফেলে।

সেদিন ক্লিনিক থেকে ক্যাবে করে বাসায় ফিরছি। দেখি হাতে ব্যান্ডেজ।

জিজ্ঞাসা করতেই বললো, অংকু বেধে দিয়েছে।

পরদিন ক্লিনিকের করিডোরে ঢুকতেই অংকু বলে একজনকে জড়িয়ে ধরে হাত দেখাচ্ছে। আমি তাদের কাছে যেতেই লোকটি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি সাবিনা?

সম্মতি জানাতেই তিনি বললেন, যদিও বারোটা দিন খুব বেশি দিন নয়, তারপরও কেমন করে ভুলে গেলে, কেমন করে কথা দিয়ে কথা রাখলে না! কেন সাবিনা অন্যের হলো? একটা বছর তুমি অপেক্ষা করতে পারলে না?

আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম তার কথাগুলো।

তারপর তিনি পরিচয় দিলেন।

পরিচয় শুনে আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে ছয় বছর আগের অতীত এসে সামনে দাড়ালো।

মিজান আবার বলতে শুরু কলো। সে লন্ডনে ফিরে গিয়ে সমস্ত কাজ গুছিয়ে নিয়ে বাবাকে রাজি করিয়ে সেন্ট মার্টিনসে গিয়ে জানতে পারলো আমরা ঢাকার বাসায় চলে এসেছি। ঠিকানার অভাবে আর যোগাযোগ সম্ভব হলো না। কিন্তু সম্ভব হয়েছিল চাদের দিকে তাকিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলা।

দুজনই যখন অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে একটু স্বাভাবিক হলাম তখন মিজান আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, কেমন আছো? বর কেমন?

কিন্তু সে আমার উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে বললো, তোমার সেই উচ্ছলতা নেই, নেই কাচ ভাঙা হাসি।

তখন মনে মনে বললাম, কি করে বুঝলে প্রিয় আমি সুখে নেই? প্রচণ্ড ভুল লোককে বিয়ে করেছি। পছন্দ করে বিয়ে করেও সংসারের প্রতি যার এতোটুকু মন নেই, স্ত্রীর অসহায়ত্বকে আঘাত করা যার আনন্দ। কেবলই দোষটুকু ধরা পড়ে। কি করে বোঝাবো ভালোবাসাহীন সংসারে বাস করছি। কাকে দোষ দেবো! ভাগ্য ছাড়া আর কাউকেই খুজে পাই না দোষ দেয়ার জন্য। তুমি ভালোবাসা দেয়ার জন্য খুজে বেড়াচ্ছো। কি দুর্ভাগ্য আমার। নিতে পারছি না।

এখন থেকে প্রতিটা ভালোবাসা দিবসে তোমাকে স্মরণ করবো আর এটুকু ভেবে সুখ নেবো যে, পৃথিবীতে অন্তত একজন আমাকে এখনো ভালোবাসে।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

M সাহেবের জীবনে M সাহেবের অবদান

– বেগম মোশাররফ

মানুষ মানুষের জন্য এ কথাটি যেমন সত্য। তেমনি সত্য ভালোবাসা। ভালোবাসা যে কতো রকম হতে পারে তার বিভিন্ন রকম উদাহরণ এই ভুবনে আছে। ভালোবাসা বলতে শুধু প্রেম নয়। প্রেম বলতে নারী–পুরুষের আবেগ জড়িত মোহকেই বোঝায় না।

আজ আমি যে ফেরেশতা রূপি মহান ব্যক্তির ভালোবাসা এখানে উল্লেখ করতে চাই সেই ব্যক্তিটি হলেন মিজানুর রহমান বা মিজান সাহেব। তিনি কোনো একটা ব্যাংকের ব্যবস্থাপক ছিলেন।

আমার এ লেখা চলাকালে তিনি শাদা কাফন পরে টান টান হয়ে ঘুমিয়ে আছেন পরপারে যাবার শেষ যানবাহনের ওপর। হাজারও কথা, কান্না তার কানে যাচ্ছে না। একবারও বলছেন না তোমরা কেদো না ধৈর্য ধরো। বিপদে ধৈর্য হারাতে হয় না।

ঠিক এমনিভাবে তিনি একদিন আমাদের সমস্ত পরিবারের কান্না থামিয়েছেন। ওনার ভালোবাসার ঋণ কখনো পরিশোধ করতে পারবো না। তার বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি আমার এ লেখার মাধ্যমে।

আমার দুঃখ রয়ে গেল, আমি প্রচণ্ড অসুস্থ থাকায় তার মুখখানা শেষবারের মতো দেখতে পারলাম না। তাই তার প্রতি শ্রদ্ধা ভরা ভালোবাসা রইলো আজকের এ লেখায়।

অনেক ভালোবাসা দেখেছি। কিন্তু এ রকম ভালোবাসা অন্তত একজন চাকরিজীবীর জীবনে স্মৃতি হয়ে রইবে, যে ভালোবাসা দেখিয়েছেন মোশাররফ সাহেবের প্রতি মিজান সাহেব।

আমার স্বামী একই অফিসের অন্যত্র শাখায় কর্মরত ছিলেন। সেখানে অফিসের এক দুর্ঘটনায় ছয় লাখ টাকা খোয়া যায় চলতি বছরের জুলাই মাসে। সেই দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে আমার স্বামী, আমাদের পরিবার। পুরো টাকার দায়ভার আমার স্বামীকেই নিতে হয়েছে। এ ঘটনায় আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি। তারপরও আমরা হাসি, কথা বলি চাকরিটা আছে বলে।

আর এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পুরো অবদানই মিজান সাহেবের। তা অল্প কথায় লিখে শেষ করা যাবে না।

আমাদের এ মহা প্রলয়ে মিজান সাহেব আল্লাহর পাঠানো দূত হয়ে এলেন। সমস্ত শহর থমথমে, অফিস পুলিশের পাহারায়, দারোগা, এসপিসহ চল্লিশ-পঞ্চাশজন সাংবাদিক অফিস তোলপাড়। পুলিশ বসে আছে আমার স্বামীকে গ্রেফতার করবে।

আমার সঙ্গে স্বামী শেষ কথা বললো, কবে দেখা হবে জানি না। তুমি ভেঙে পড়ো না। আল্লাহকে স্মরণ কর। আল্লাহ সহায় থাকলে সমস্ত বিপদ থেকে বেচে যাবো।

আমাদের পরিবার তখন এক করুণ পরিণতির মুখে। ঠিক সেই মুহূর্তে মিজান সাহেব যা করলেন, যে ভালোবাসা দেখালেন সেটা কোনো বাবাও তার সন্তানের এমন বিপদে এগিয়ে আসেন বলে মনে হয় না। আমাদের চোখের পানি মুছিয়ে মুখের হাসি ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি।

মিজান সাহেব ওই মুহূর্তে অফিসের ছয় লাখ টাকা জমা দিলেন, বড় সাহেবদের হাতে-পায়ে ধরলেন টেলিফোনে। তার সাধ্য মতো চেষ্টা করলেন।

আল্লাহর রহমতে মিজান সাহেবের চেষ্টায় খেয়ে-পরে বেচে আছি।

অথচ আমার স্বামীর সহকর্মীরা *চাচা আপন প্রাণ বাচা* বলে নিজেরা বাচার জন্য তাকে ঠেলে দিল জেলের মুখে।

যদিও তার টাকাটা পনেরো দিনের মধ্যে দিতে হয়েছিল জমি বিক্রি করে। কারণ, টাকাটা ছিল তার ম্যানেজ করা। ওই মুহূর্তে এতো বড় বুকের পাটা নিয়ে এগিয়ে আসার মতো মানুষ হয়তো পৃথিবীতে দুই একজন আছেন এখনো। তাই পৃথিবীটা এতো ঝুকিপূর্ণ হলেও সুন্দর। টাকা-পয়সার ঋণ শোধ করা যায়। কিন্তু ভালোবাসার ঋণ শোধ করা যায় না।

আর কোনোদিন তার সঙ্গে দেখা হবে না। আমাদের জন্য তিনি যা করলেন, অথচ আমরা তার জন্য, তার পরিবারের জন্য কিছুই করতে পারলাম না। এটা আমাদের ক্ষমতার বাইরে। তিনি গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় (৩১ ডিসেম্বর ২০০৩) হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না......রাজেউন। আল্লাহপাক তার আত্মাকে শান্তি দিন।

ঝিনাইদহ থেকে

শেষ উপহার

– রিনি চৌধুরী

২০০২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি। এখনো মনে পড়ে সেদিনের কথা। কথা ভালোবাসতো প্রিতমকে।

প্রায় পাচ বছর ধরে তাদের এই সম্পর্ক ছিল। তারা দুজনে এক সঙ্গে ঢাকার এক এনজিও–তে চাকরি করতো। কথা এমএসসি পাস করেছে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে বোটানি–তে। প্রিতম একটা কলেজ থেকে ডিগ্রি পাস করেছে। ইউনিভার্সিটিতে আসার সুযোগ হয়নি। চাকরির সুবাদে দুজনের পরিচয়। প্রিতম দেখতে লম্বা, হ্যান্ডসাম, যে কোনো মেয়ে দেখলেই তার প্রেমে পড়বে। কথার বেলাও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

মেয়ে পটানোতে প্রিতম ওস্তাদ। সেই চিরাচরিত পটানো প্রশংসা ‘তুমি খুব সুন্দর, শ্যামলা মেয়েদেরকেই দেখতে বেশি ভালো লাগে। তুমি খুব স্মার্ট ইত্যাদি।’ মানুষ যতোই বুদ্ধিমতি হোক না কেন, নিজের প্রশংসা শুনতে শুনতে এক সময় সবই যেন বিশ্বাস হয়, সত্যি মনে হয়। কথারও তাই হয়েছিল।

দুজনের অফিসের বাইরেও দেখা অর্থাৎ ডেট হতো নিয়মিত। এদিকে বাড়িতে কথা–র বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। প্রিতমকে কথা বিয়ের কথা বলাতে প্রিতম বলেছিল, এতো তাড়া কেন, যতোদিন এভাবে থাকা যায় ততোই আনন্দ, বিয়ে হয়ে গেলে তো অনেক ধরনের দায়দায়িত্ব এসে পড়বে এবং ওই জীবনই বেশি দীর্ঘ। আমরা আর কিছুদিন পরেই না হয় ভাববো।

কথা বাড়িতে কোনোভাবে বুঝিয়ে তখনকার মতো থামিয়ে রেখেছিল।

একদিনের ঘটনা। কথা তার মামার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল সাভারে। সেখান থেকে তারা ভাইবোনেরা মিলে স্মৃতিসৌধে বেড়াতে গিয়েছিল। হঠাৎ করে তারা আবিষ্কার করলো লেকের ধারে গাছের আড়ালে এক যুবক–যুবতীর গভীর আলিঙ্গনের দৃশ্য। কথা ভালো করে খেয়াল করতেই দেখে যুবকটি প্রিতম। কিন্তু প্রিতম কথাকে দেখেনি।

ওইদিন কোনো রকমে ওখান থেকে চলে আসার পর রাতে কথার আর ঘুম হলো না। গভীর কান্নায় ভেঙে পড়লো। পাশে শুয়ে ছিল মামাতো বোন মিলি। সে কথার অবস্থা দেখে তাকে অনেক সান্ত্বনা দিল এবং একটা বুদ্ধি শিখিয়ে দিল প্রিতমকে উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য। কথা ঢাকায় ফিরে এলো। খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে অফিস শুরু করলো এবং প্রিতমের সঙ্গে কথাবার্তাও ছিল খুব স্বাভাবিক।

এর কিছুদিন পর ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেনটাইনস ডে। কথা প্রিতমের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করলো ওরা ওই দিনই স্মৃতিসৌধে ঘুরে কাটাবে। এদিকে মিলির সঙ্গে কথা ঠিক করে রেখেছিল মিলি লেকের ওই গাছ থেকে একটু দূরে বসে থাকবে। সময় ঘনিয়ে এলো। তারা দুজন ঠিক সেই গাছটির কাছে বসলো।

কথাকে যেই মাত্র প্রিতম ভ্যালেনটাইন চুমু দিতে যাবে ঠিক তখনই কথা জোরে ঘুরে দাড়িয়ে পড়লো এবং আচমকা শরীরের পুরো জোর দিয়ে কষে মারলো এক চড়। সমস্ত শরীর কাপছিল এবং কথা যেন আর কথা বলতে পারছিল না। শুধু বলেছিল, এটাই তোমার জন্য আমার ভ্যালেনটাইন–এর শেষ উপহার। তারপর হন হন করে হাটা শুরু করলো, যেন এ হাটার আর শেষ নেই...।

মন্ট্রিঅল, কানাডা থেকে

ঘোরের মধ্যে

– কবীর

I am sixteen, she is twenty six. But I madly love her. একটি টিনএজ বালকের কৌতূহল, অপ্রাপ্ত বয়সের অবুঝ ভালোবাসা, বয়ঃসন্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে নানা চাওয়া–পাওয়া এবং চূড়ান্ত প্রাপ্তির সময়ে শেষ পরিণতি দেখানো হয়েছে *এক ছোটিসি লাভ স্টোরি* নামে একটি হিন্দি সিনেমাতে।

কোনো কিছু ঠিকমতো বুঝে ওঠার আগেই এতোটুকুও বুঝতে পারলাম তাকে খুব বেশি ভালোবেসে ফেলেছি। সব সময়ই এতোটা টান অনুভব করতাম যা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আমার অবস্থাটা হয়েছিল উপরোক্ত সিনেমার থেকেও অন্য রকম। অনেকটা এ রকম : I am twenty six, she is thirty two and mother of two babies. But I not only madly, but also desperately love her.

আমার সেই ভালোবাসার আপা ও আমি একই অফিসে চাকরি করি। গায়ের রঙ, শারীরিক কাঠামো, উচ্চতা, বাচনভঙ্গি, চলাফেরা, সব মিলিয়ে খুবই সুন্দরী। তাকে প্রথম দেখেই অন্য রকম ভালো লেগেছিল। শুধু আমার চোখেই নয়। অন্য সবার কাছেই তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। আমার অফিসের সবার তুলনায় আমি কম বয়সী হওয়ায় খুব সহজেই তার সঙ্গে আমার চলা-ফেরা, কথা-বার্তা বেশি হতো। এভাবেই চলতে থাকলো দিনের পর দিন...।

আমি খুবই হাসি-ঠাট্টা করে থাকি সবার সঙ্গে। চাকরি জীবনে প্রবেশ করি এমন সময়ে যখন আমার ছাত্র জীবন শেষ হয়নি। তাই কলেজের আড্ডাটা তখনো ভুলে যেতে পারিনি। আমাদের দুজনের সেকশন আলাদা হলেও প্রতিদিনই তিন চারবার তার রুমে যেতাম। বিভিন্ন গল্প, কথা-বার্তা, হাসি-ঠাট্টা, দুষ্টুমি ইত্যাদির সঙ্গে উপলব্ধি করলাম, আপা বেশ মিশুক এবং আমার কিছু বাড়তি দুষ্টুমি তিনি সহ্য করছেন অনায়াসেই। দিন যতো যাচ্ছে ততোই আমাদের গভীরতা বাড়ছে...।

মাঝে মধ্যে বেশ উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যেতাম। কেননা আমার অনুসন্ধিৎসু চোখ সব সময়ই তার শারীরিক সৌন্দর্য উপভোগ করতো। এমনিতেই সুন্দরী, তারপরে সুগঠিত শারীরিক অবয়ব। এবং এতো বেশি কাছাকাছি বসে গল্প করতাম যে, আমার মতো বয়সের একটি যুবক ছেলে কি করে নিজেকে সংযত রাখে! এভাবেই আস্তে আস্তে বিভিন্ন এডাল্ট জোকস, এডাল্ট কথাবার্তা চলতে থাকে! তাতে দুজনাই বেশ স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছি নিজেদের মধ্যে।

আরেকটি কথা না বললেই নয় তা হলো, আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসি যার কথা আপাকে সব বলতাম। বাড়িতে গিয়ে তাকে কিভাবে, কোথায় কোথায় আদর করতাম সব কিছুই তাকে বলতাম, এমনকি আমার ভালোবাসার মানুষটির মাসের বিশেষ দিনটি নিয়েও আপার সঙ্গে আলোচনা করতাম। এরই মাঝে তাকে জিজ্ঞাসা করতাম গত রাতে দুলাভাই কতোবার আদর করেছেন অর্থাৎ জানতে চাইতাম আরো অনেক কিছু।

তিনি লজ্জায় লাল হতেন এবং বলতেন, বেশি ফাজলামি হচ্ছে না! আপনি না আমার ছোট ভাই, বড় বোনকে কি এসব কথা কেউ জিজ্ঞাসা করে!

এ কথাটি তিনি প্রায়ই বলতেন আর আমিও তখন থেমে যেতাম।

তিনি প্রায়ই অফিসে নাশতা নিয়ে আসতেন এবং আমাকে নিয়ে এক সঙ্গে বসে খাবার খেতেন। এ সময়ে খাবার নিতে গিয়ে ইচ্ছা করেই তার হাতটা স্পর্শ করতাম এবং কিছুতেই লিখে বা বলে আমার সে সময়ের শারীরিক, মানসিক উপলব্ধির কথা প্রকাশ করতে পারবো না।

আস্তে আস্তে তার প্রতি আমার আকর্ষণ অনেক বেশি, প্রচণ্ড, প্রচুর, খুব বাড়তে থাকে। তিনি যেহেতু নিষেধ করতেন না বা রাগ করেননি সেহেতু মাঝে মধ্যে ইচ্ছা করেই তার শরীরের বিভিন্ন অংশে স্পর্শ করতাম এবং উপভোগ করতাম এক আনন্দ।

তার পোশাক নিয়েও বেশ মজার হাজার কথা বলতাম। আজ এই পোশাকে আপনাকে খুব সুন্দর লাগছে বা আজ খুব সেক্সি সেক্সি লাগছে এ রকম।

গত শীতে আপা একদিন শালের নিচে লাল জর্জেটের শাড়ি পরে এসেছেন। বললাম, আপা, জর্জেট শাড়িতে আপনাকে দারুণ মানিয়েছে। কিন্তু শালের জন্য আপনার শারীরিক সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছি না। আমাকে একটু শালটা খুলে দেখাবেন আপনার ঢেকে রাখা সৌন্দর্য? নিজেই তখন অবাক হয়ে গেছি যে, এ রকম একটি প্রস্তাব কিভাবে তাকে করলাম।

কিন্তু আমাকে হাজারগুণ বেশি অবাক করে দিয়ে তিনি উঠে দাড়িয়ে তার শালটি মেলে ধরে আমার সামনে দাড়ালেন। এমনিতেই এতো সুন্দর ফিগার আর জর্জেটের শাড়ি শরীরে লেপ্টে লেগে থাকায় তার সুউচু পাহাড়ের মতো বুক আমার চোখ ধাধিয়ে দিচ্ছিল। আমি এক পলকে তার ওই সৌন্দর্য উপভোগ করতে থাকলাম।

কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, কি, দেখা হয়েছে?

বললাম, জি।

তিনি শাল দিয়ে আবার তার সৌন্দর্য ঢেকে বসে পড়লেন।

একদিন তিনি একটি শাদা জামা পরে এসেছেন। সেদিন তার খুব কাছাকাছি দাড়িয়ে আছি। তখন আমার চোখ তার জামার গলার দিকটা থেকে আস্তে আস্তে নিচে নেমে গেল অনেক দূর পর্যন্ত টের পেলাম। তখন আর সহ্য করতে পারছি না। তাকে বলেই ফেললাম, আপা, এ জামা পরে অফিসে আসবেন না। কেননা আপনার বুকের অনেকটা আমি দেখে ফেলেছি।

তিনি খুব লজ্জা পেলেন। কিন্তু আমাকে কিছুই বললেন না। আপার ঘাড়ের নিচের অংশটুকু ছিল আমার সবচেয়ে আকর্ষণীয়। প্রায়ই ওই জায়গাটি স্পর্শ করতাম এবং খুব পুলকিত হতাম।

একদিন আপাকে বললাম, আপা, আমি একটি চুমু দিতে পারি এই সুন্দর জায়গাটিতে?

শুনে তিনি খুব অবাক হলেন। কিন্তু রাগ করেননি বা কিছুই বলেননি।

আমিও আর সহ্য করে থাকতে পারলাম না। তার ওই সুন্দর জায়গাটিতে একটি চুমু দিয়ে সোজা আমার রুমে চলে এলাম।

আরেকদিন নিতম্ব স্পর্শ করে বলেছিলাম, আপা, আপনার এই জায়গাটি অনেক বড় হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে অফিসে কেউ কেউ কানাকানি করতো আমার এবং আপার সম্পর্ক নিয়ে। অনেকে এমন মন্তব্য করতো আমার কাছে এসে যা মুখে বলা সম্ভব নয়। বলতাম, দেখেন, ভালো সম্পর্ক মানেই এমন নয় যে, বাজে সম্পর্ক।

সত্যি বলতে যখন এসব করতাম তখন খুব সতর্কভাবে করতাম যাতে কেউ-ই টের না পায়, কিন্তু আমার গতিবিধি আমার অগ্রসরের চেয়ে তাদের লক্ষগুণ ভাবাতো। তাই কতো ধরনের কতো কিছু যে শুনেছি!

হঠাৎ করেই তিনি খুব অসুস্থ হয়ে প্রায় দুই মাস ছুটিতে থাকলেন।

বেশ কয়েকবার সে সময়ে তার বাসায় গিয়েছি।

তার নয় বয়সের ছেলেটিকে এবং চার বয়সের মেয়েটিকে বললেন, তোমাদের একটি মামা।

মেয়েটি কি সুন্দর ফুটফুটে হয়েছে, মায়ের থেকেও সুন্দর হবে বড় হলে। আমাকে কি সুন্দর মায়া মাখা ভাবে বলতে লাগলো মামা।

তাতে আমার মনটা ভরে গেল।

আপা তখন আমাকে বললেন, কবীরভাই, আপনাকে তো ছোট ভাইয়ের মতো মনে করি। যদি আমার একটি কাজ করে দিতেন?

সানন্দে কাজের দায়িত্ব নিলাম এবং কাজ শেষে পরের দিন আবার তার বাসায় উপস্থিত হলাম।

আপা তখন তার মেয়েকে ভাত খাওয়াচ্ছিলেন। আমাকে তিনি ভাত খেতে বললেন।

আমি খেতে রাজি না হলে তিনি আমার কাছে এসে তার নিজের হাতে আমাকে খাইয়ে দিলেন এবং বললেন, ছোট ভাইকে তো বড় বোন এভাবেই খাবার খাওয়ায়।

খুবই আনন্দের সঙ্গে তার হাতে খাবার খেলাম এবং এক পরম স্নেহমাখা ভালোবাসা অনুভব করলাম।

আমার তখন মনে পড়লো, আপা একদিন অফিসেও অনেকের সামনে আমাকে গালে তুলে খাইয়েছিলেন এবং সবাইকে বলতেন, সে তো আমার ছোট ভাই। অথচ আমি....।

কি ঘোরের মধ্যেই না আমি ছিলাম। নিজের প্রতি নিজের খুব ঘৃণা জন্মালো। যে বোন আমাকে এতোটা স্নেহ করেন, এতোটা ভালোবাসেন, যে অনেক আপত্তিকর কথা বললেও, কাজ করলেও কোনোদিন একটুও আমার ওপর রাগ করেননি, বরং মনে করেছেন ছোট ভাই করেছে। বলেছেন, তিনি ভুলে গেছেন।

কিছুতেই আমার সেই নষ্ট মনমানসিকতাকে ক্ষমা করতে পারছি না। তাই নিজেকে শোধরাতেই হবে এই প্রতিজ্ঞা করলাম।

এরই মধ্যে অফিশিয়াল নিয়ম অনুযায়ী অন্য অফিসে আমার সেই প্রিয় আপাটির পোস্টিং হয়ে গেল। প্রথম যখন তার পোস্টিংয়ের কথা শুনলাম তখন মনটা এতো বেশি খারাপ হয়ে গেল, বুকটা এমন হাহাকার করতে লাগলো যে বলে বোঝানো সম্ভব নয়। বার বার মনে হচ্ছিল, হারিয়ে ফেলছি আমার সেই স্নেহমাখা ভালোবাসা, হারিয়ে ফেলছি আমার প্রিয় আপাটিকে।

আপা অন্য অফিসে চলে গেছেন।

আপা, তুমি যেখানে থাকো, মহান আল্লাহ যেন তোমাকে ভালো রাখে। তোমার সেই স্নেহমাখা ভালোবাসা পাওয়ার জন্য তোমার এই ভাইটি সারাটি জীবন তোমার পানে ছুটে যাবে।

ক্যান্টনমেন্ট থেকে

এক যুগ

– সাবরীনা সোহেলী সুমি

ডাবল প্রমোশনের সুবাদে বেবি ক্লাস থেকে ক্লাস টু-তে ভর্তি হই ১৯৯২ সালে যদুনাথ প্রাইমারি স্কুলে। রোল হয় সবার লাস্টে। আমার এক পরিচিত বান্ধবীর মাধ্যমে পরিচয় হয় আমার ক্লাসেরই একজনের সঙ্গে। নাম কোহিনূর।

আমরা ছিলাম পাশাপাশি গ্রামের বাসিন্দা। তখন থেকে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। তারপর যখন ক্লাস থ্-তে লাস্ট থেকে ফার্স্ট হলাম তখন সে হলো থার্ড। এভাবেই চলতে লাগলো। মনে আছে ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পাবার অভিপ্রায়ে আমরা দুজন একই স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়তে লাগলাম। ফলে দুজনে ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হলাম।

তখন প্রতিদিন তাদের বাড়িতে যেতাম। সকালে পড়া শেষ করে উল্টো তাদের বাড়িতে গিয়ে তাকে এনে তারপর দুজনে এক সঙ্গে স্কুলে যেতাম। আমরা এতো ঘনিষ্ঠ ছিলাম যে, তাদের বাড়ির গাছের যদি একটি কাঠালও পাকতো তবে তার মা মানুষের মাধ্যমে হলেও আমাকে খবর দিয়ে নিয়ে খাওয়াতেন।

একবার তার সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি হয় কে বেশি পড়ে তা নিয়ে। এ জন্য সে আর আমি গাল ফুলিয়ে প্রায় তিন চার দিন কথা বলিনি। কিন্তু ঠিকই তাদের বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে কথা না বলে তাকে নিয়ে আসতাম এবং তাড়াহুড়োর জন্য আমি খেতে বসলে সে আমার চুল বেধে দিতো। আমি ড্রেস পড়তে গেলে সে আমার ব্যাগ গোছাতো। তারপর আমরা একই রাস্তার দুই পাশ দিয়ে রেললাইনের মতো করে স্কুলে যেতাম। তবে কথা বলতাম না।

তারপর প্রাইভেট স্যার সেটা লক্ষ্য করে হ্যান্ডশেক ও কোলাকুলির মাধ্যমে মিল করে দেন।

বর্ষাকালে যখন প্রাইভেট পড়তে গিয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতো তখন তার আর আমার ভাই ছাতা নিয়ে আমাদের আনতে যেতেন। বই-খাতা ব্যাগে ভরে, পোশাক হাটু পর্যন্ত উঠিয়ে একই ছাতার নিচে দুজনে কি মজা করেই না বাড়ি ফিরতাম!

১৯৯৫-এর পূজার আগে আমার টাইফয়েড হয়েছিল। পূজার বন্ধসহ প্রায় পনেরো বিশ দিন বিছানায় ছিলাম। সে প্রতিদিন দুই তিনবার আমাকে দেখে যেতো। তখন তার আচরণে এক অদৃশ্য মায়ার ছায়া দেখতে পেতাম।

তারপর আমরা একই হাই স্কুলে ভর্তি হলাম। দুজনেই ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেলাম। ক্লাস সেভেনের প্রথম দিকে যখন আমার বাবা মারা গেলেন তখন সে আমাকে শান্ত করার দায়িত্ব নিল। সে সারাক্ষণ আমার পাশে থেকে কতো যে সান্ত্বনার বাণী শোনাতো তার ইয়ত্তা নেই।

তারপর ক্লাস এইটে দুজনই বৃত্তি পরীক্ষা দিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তি পেলেও সে পেল না। ওই দিন স্কুল থেকে ফিরে সন্ধ্যার সময় দৌড়ে গেলাম তাদের বাড়িতে। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে তারপর ফিরলাম।

এই উত্থান-পতনেও আমাদের সম্পর্কের এতোটুকু ফাটল ধরেনি, বরং দ্বিগুণ উৎসাহ ও পরিশ্রমে আমরা এসএসসি যুদ্ধে নামলাম।

অবশেষে দুজনই এসএসসি-তে সায়েন্স গ্রুপ থেকে 'এ' গ্রেড পেলাম ২০০১ সালে। ভর্তি হলাম দুজনই নাগরপুর সরকারি কলেজে। কেউ যদি কোনো কারণে একদিন কলেজে না যেতাম তবে বাড়ি থেকে গন্তব্য স্থল এবং পরবর্তীকালে বাড়ি ফেরা না পর্যন্ত সকলেই জিজ্ঞাসা করতো আরেকজন কই?

উত্তর দিতে দিতে মুখ ব্যথা হয়ে যেতো।

আমরা এমন যে, একজন আরেকজনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক দুর্বলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলি না। কেউ কোনো সিদ্ধান্ত নিলে অন্যজন তার বিরোধিতা করি না পাছে মনোমালিন্যের মাধ্যমে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। তবে দুজনের যে কোনো সিদ্ধান্ত আমরা আলোচনার মাধ্যমে নিয়ে থাকি। আসলে আমরা দুজন দুজনের মতামত, সিদ্ধান্ত, আবেগ, অনুভূতি, সর্বোপরি সব কিছুর ওপর দারুণভাবে শ্রদ্ধাশীল।

এই ফেব্রুয়ারিতে আমাদের বন্ধুত্ব নামের ভালোবাসার বারো বছর মানে এক যুগ পূর্ণ হচ্ছে। কি নিরবচ্ছিন্ন বন্ধুত্ব, তাই না? কখনো যদি তাকে প্রশ্ন করি, তুই এতো ভালো কেন?

উত্তরে সে ডায়মন্ডের মতো হাসি দিয়ে বলে, আসলে তোর মন হাজার মনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ তো! তাই তুই এভাবে ভাবিস।

তার মুখ থেকে এ কথা শোনার পর আমি স্ট্যাচুর মতো তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। মাঝে মধ্যে ভাবি, কোনো জনমে হয়তো এমন কোনো পুণ্য করেছিলাম যার জন্য সঙ্গী হিসেবে তাকে পেয়েছি। সত্যিই তাকে পেয়ে আমি ধন্য।

যাযাদির এই *ভালোবাসা* সংখ্যার মাধ্যমে তাকে জানাই আমার হৃদয়ে সঞ্চিত এক যুগের হিমালয়সম ভালোবাসা।

নাগরপুর, টাংগাইল থেকে

ভ্যালেন্টাইনস ৫০

– মির্জা মতিউর রহমান

কমবাইন্ড মিলিটারি হসপিটাল, সংক্ষেপে সিএমএইচ (CMH), বগুড়া। সার্জিকাল ওয়ার্ডের বারান্দায় হুইলচেয়ারে বসে ৩০ ডিসেম্বর, *বর্ষ পরিক্রমা,* যাযাদি ২০০৩ পড়ছিলাম।

যাযাদির সঙ্গে গাটছড়া বেধেছি এর জন্মলগ্ন থেকেই। প্রায় দেড় যুগ আগে সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়েছি, বয়স সত্তর ছুতে চলেছে। যে ব্যাধিতে পঙ্গু হয়ে হুইলচেয়ার ধরেছি তাতে ২০০৩-এর মতোই হয়তো ঝরে যাবো নিঃশেষে। মনে এলোমেলো চিন্তার ঝড়। কেন যেন মন বারে বারে ফিরে যায় মরা অতীতে, ফেলে আসা সোনালি দিনের বালুবেলায়!

১৯৫২ সালের কথা। বগুড়া আযিযুল হক কলেজ জেলার একমাত্র ডিগ্রি কলেজ। মহিলা কলেজ না থাকায় কোএডুকেশন চালু ছিল। ফার্স্ট ইয়ার বিএতে পড়ি। ঢাকা 'এ' ডিভিশন লীগে ফুটবল খেলি, অ্যাথলেটিক্সে পূর্ব পাকিস্তান দলে স্থান পেয়েছি। কলেজ ব্লু পেয়েছি। পর পর দুবার কলেজের ক্রীড়া সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছি।

একটা ছাত্র সংগঠনের পাতিনেতা হিসেবে জেলাতেও বেশ নাম হয়েছে। সব মিলিয়ে বেশ একটা রমরমা ভাব। অনেকটা *কি হনুরে বাপ* এ রকম একটা আমেজ।

শ্রদ্ধেয় পাঠক, পাঠিকা ভাবছেন, এই সেরেছে রে, বুড়োটা নিশ্চয়ই কোনো রমরমা প্রেম কাহিনীর শুরুর ফন্দি বা পায়তারা ভাজতে যাচ্ছেন?

মাই ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স, সবিনয়ে নিবেদন করছি, যদিও ইচ্ছার অভাব ছিল না তবুও আমাদের সময় প্রায় সুযোগ ছিল না বলতে হয়। পাড়াতো বোন হাসিনা, সখিনা, জরিনা, রেহানাদের পিছে প্রেমের জন্য দৌড়ানো *সুইসাইড স্কোয়াডে* নাম লেখানোর মতোই রিসকি ছিল। অতএব, ও পথে কাটা।

আমাদের পাচজনের একটা বন্ধু গ্রুপ ছিল, শেখ আবদুর রহমান (বর্তমানে লন্ডনবাসী), বারী, বুলু, নুননু আর এই অধম সেই ক্লাস থৃ থেকে শুরু করে ডিগ্রি পর্যন্ত সুপার গ্লু-র মতো লেগেছিলাম।

কলেজে ঢুকেই প্রজেক্ট হাতে নিলাম, এবার প্রেমে পড়তেই হবে। তখন উত্তম-সুচিত্রার যুগ চলছে। স্মার্ট হওয়ার জন্য সিগারেট ধরলাম। উত্তম ঢঙের চৌত্রিশ ইঞ্চি ঢোলা প্যান্ট, উত্তম স্টাইলের চুল কোনো কাজই দিল না। কারণ, মেয়েগুলো রিকশা থেকে নেমেই সোজা তাদের কমনরুমে ঢুকতো। স্যারেরা যখন যার ক্লাস থাকতো, মেয়েদের ডেকে নিতেন।

মেয়েগুলো ভীরু মেষশাবকের মতো স্যারদের পিছু পিছু ক্লাসে ঢুকে স্যারের লেকচার ডায়াস-এ ডানদিকের সংরক্ষিত বেঞ্চে বসতো। লেকচার শেষে স্যারকে অনুসরণ করে কমনরুম প্রত্যাগমন। পাচ বিড়ালের ভাগ্য আর শিকা ছেড়ে না।

আমাদের মধ্যে রহমানটা ছিলো ধান্দাবাজিতে জিনিয়াস। নানান রকম ফন্দি-ফিকির ওর মাথায় আসতো।

বোর্ড মিটিং বসলো। সভাপতি যথানিয়মে রহমান। আলোচ্য বিষয়, ইনডিয়ান প্রায় সিনেমায়ই দেখি কলেজের মেয়েগুলো তাদের সহপাঠীদের সঙ্গে তুই-তোকারি করে, বাদাম-চানাচুর চিবোয়, নোট লেন-দেন করে, বাগানে অথবা গাছতলায় বসে, অনেকে প্রেমের আদান-প্রদান করে, ফুলের তোড়া বা অন্যান্য গিফটও দেয়। অথচ ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, আমাদের কলেজের মেয়েগুলো কোনোদিন ফিরেও দেখে না। সর্বসম্মতিক্রমে পাচজনকে সিলেকট করে তাদের নাম দেয়া হলো। যেমন শামীম আরা চুমকি বসানো জামা পরতো ওর নাম *লুকিং গ্লাস।* ডাক্তারের মেয়ে হেনা, ওর নাম হলো *বরিক পাউডার।* রোখসানা দেখতে একটু মুটকি, ওর নাম হলো নানি। ছায়া হালকা-পাতলা গড়নের, ওর নাম হলো *ললিতা।* শাহিদা বোরখা পরে কলেজে আসতো, ওর নাম *খালাম্মা।*

কলেজ শুরু হওয়ার আগেই আমরা সাইকেল নিয়ে কলেজে পৌছে যেতাম। সাইকেল স্ট্যান্ডে রেখে আমরা কলেজ গেটে দাড়িয়ে থাকতাম। যখন যে নায়িকার রিকশায় আগমন হতো, তখন আমাদের দেয়া খেতাবি নামে আমরা চিৎকার করে ডাকতাম। কেউ প্রতিবাদ করতো না, মাথা নিচু করে চলে যেতো।

সত্যিই সে যুগের মেয়েরা ছিল অবলা, সর্বংসহা ধরণির মতো। কোনোদিন কেউ কমপ্লেন করেনি। এই তো কিছুদিন আগে খবরের কাগজে সবাই শান্তাহারের ঘটনা পড়েছেন নিশ্চয়ই? তিন এনজিও মহিলাকর্মী অফিস যাবার পথে এক যুবক দোকানে বসে ওই মহিলাদের উদ্দেশ্যে *বুকটা ফাইটা যায়* গান গেয়ে ওঠে। প্রতিবাদে ওই মহিলা তিনজন দোকানে প্রবেশ করে ওই যুবককে রামধোলাই দেয়।

আজ এ বৃদ্ধ বয়সে হুইলচেয়ারে বসে হাসি পাচ্ছে এই ভেবে যে, সেই সময় আমরা যে ফচকেমিগুলো করেছি, আজকালের যুগে হলে দুই চারটা স্যান্ডালের প্রহার আমাদের মাথায় অথবা পিঠে পড়তে পারতো।

রহমানের দ্বিতীয় প্রেসকৃপশন ফেল হবার পর অগত্যা আমাদের প্রতীক্ষা করতে হতো কবে আবার আমাদের কলেজ ইলেকশন হবে। ইলেকশনের সময় আমরা দল বেধে ছাত্রছাত্রীদের বাসায় যেতাম ভোট চাওয়ার জন্য। কড়া নাড়তাম দরজার। অভিভাবক দরজা খুলে দিতেন, প্রশ্ন করতেন, তোমরা?

আমরা সালাম দিয়ে সবিনয়ে আর্জি পেশ করতাম, চাচাজি, আমরা এসেছি কলেজ ইলেকশনের ব্যাপারে অমুকের সঙ্গে একটু কথা বলবো।

কোনো কোনো অভিভাবক দরজা খুলে ড্রয়িংরুমে বসতে দিতেন, মেয়েকে ডেকে দিতেন। আমাদের ভোটের কথা আমি বলতাম।

মেয়েটা মৃদু হেসে আচ্ছা বলতো, চায়ের কথা বলতো।

আমরা পেখম খোলা হাসি দিয়ে, দশ জায়গায় যেতে হবে বলে চলে আসতাম।

কিন্তু ব্যতিক্রমই হতো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। কড়া নাড়ার পর অভিভাবক দরজা খুলে দিতেন।

আমরা আর্জি জানাতাম। তিনি গেট হতেই মেয়েকে ডেকে দিতেন। আমরা ভোটের কথা বলতাম।

মেয়েটি মৃদু হেসে আচ্ছা বলতো।

আমরা চলে আসতাম।

এসব ক্ষেত্রে বাড়ি থেকে কিছুদূর আসার পরই রহমান নিজের বুকে চাপড় মেরে বলতো, *এই, সবাই শোন! আমি সিলেইট্টা শেখ আবদুর রহমান, প্রমিজ করছি, বিএটা পাস করার পরই দারোগার চাকরি নেবো আর ওই হালার পুতেরে শ্বশুর বানাবো।*

ওর কথায় আমরা হা হা করে হাসতাম। সান্ত্বনা দিতাম। বলতাম, দোস্ত, দুঃখ করিস না, দেবী দর্শন হলো, ভোটের প্রতিশ্রুতিও পেলাম। মাফ করে দে তোর হবু শ্বশুরদের।

আবার সবাই মিলে হো হো হা হা হাসি। আমাদের পঞ্চপাণ্ডবের ভাগ্যে প্রেমের দেবতা *অতনুর* বরপাত্র না মিললেও প্রেম-পিরিতির দুর্ঘটনা বা সুঘটনা পঞ্চাশ ষাটের দশকে দুই একটা না ঘটতো এমন নয়।

১৯৫২ সালের মাঝামাঝি। আমাদেরই এক সহপাঠী মুখচোরা ভেজা বিড়াল বাদল লজিং থাকতো শহরের এক নামকরা উকিল সাহেবের বাসায়। এক সকালে দ্রুত সারা শহরে ছড়িয়ে পড়লো যে, সেই উকিল সাহেবের মেয়ে ক্লাস টেন-এ পড়ুয়া ছাত্রীর হাত ধরে প্রেমের টানে তারা পাড়ি জমিয়েছে অজানার উজানে।

বগুড়ার তখনকার একমাত্র পত্রিকা সাপ্তাহিক *নিশান*-এ ঘটনাটা বেশ ফলাও করে হেডলাইন হয়েছিল। *টুইন টাওয়ার* ভাঙার পর এখন যেমন আমেরিকায় ঘৃণা মিশ্রিত সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয় মুসলমানদের, ওই ঘটনায় আমাদের কলেজের ছাত্রদেরও সেরূপ সন্দেহে দেখা হতো। এমনকি সমস্ত বগুড়া শহরে মেয়ে আছে এমন বাড়িতে যারা লজিং থাকতো, সবাইকে সে সময় লজিং হারিয়ে বিপদে পড়তে হয়েছিল।

সময়ের বিবর্তনে অনেক কিছুই সহজ হয়ে যায়, স্বাভাবিক হয়ে যায়। যেমন আজ এই ২০০৪ সালে একজন সহপাঠী-সহপাঠিনীর মেলামেশা, কথা বলা অতি সাধারণ ব্যাপার। একজন ছেলের সাথে একজন মেয়ের প্রেম বা ভালোবাসাও অতি সাধারণ ব্যাপার। আমাদের মতো ব্যাকডেটেড বুড়োরাও প্রেমপিরিতিকে অতি

সাধারণভাবেই মেনে নেন। তাই হয়তো আজকাল বিয়ের আগে অনেক অভিভাবক ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয় যে, তাদের কোনো চয়েস আছে কি না?

প্রেম বা ভালোবাসার এই বিবর্তনে *যাযাদি* এক নির্ভীক সৈনিক। যাযাদিই বাংলাদেশে প্রথম প্রবর্তন করে *ভালোবাসা দিবস* বা ভ্যালেনটাইনস ডে-র।

প্রতি বছর *ভালোবাসা* সংখ্যা হাতে এলেই যাযাদিকে ধন্যবাদ দিই, *ভালোবাসার দুয়ারে* বাংলাদেশকে এক কাতারে দাড় করানোর জন্য। আর মনের অজান্তেই ঝরে পড়ে দুফোটা অশ্রু প্রথম ভালোবাসা সংখ্যার লেখিকা প্রয়াত মেরীনা পূরবী হালদারের জন্য।

নাটাইপাড়া, বগুড়া থেকে

সাতাশ বছর

– নিলুফার কবির

বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ সাতাশটি বছর কিভাবে কেমন করে যে এক সঙ্গে কাটিয়ে দিলাম তা ভাবতেই অবাক লাগে। কতো যে মধুর স্মৃতি ভেসে উঠছে চোখের পর্দায়।

বিয়ের পর কিছুদিন মা-বাবার কাছেই ছিলাম গ্রামে। সে থাকতো ঢাকায়। সময় পেলেই টুক করে চলে আসতো আমার কাছে। প্রতিটি ক্ষণ তার কাছেই রাখতে চাইতো আমাকে। কতো বাহানা দিয়ে চলে আসতে চাইতাম সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। কিছুতেই উঠতে দিতো না তার পাশ থেকে। শাড়ির আচল পেচিয়ে ধরে রাখতো। তার এসব পাগলামি দেখে হেসেই মরে যেতাম। কারণ, বিয়ের প্রথম প্রথম তার প্রতি আমার ভালোবাসা একটুও জন্মায়নি।

ঢাকায় চলে আসার সময় তার চোখ ছল ছল করতো আর আমি বুঝতেই পারতাম না তার ভালোবাসার গভীরতা। আমরা যে ঘরটিতে ঘুমালাম তার জানালার পাশেই ছিল একটা বেলি ফুলের গাছ। ফুলে ফুলে ছড়িয়ে ছিল পুরো গাছটি। রোজ রাতে সে অনেক অনেক ফুল এনে ছড়িয়ে দিতো আমার সারা গায়ে বিছানায়। সকালে ঘুম ভাঙলেই স্নিগ্ধ মন মাতানো বেলি ফুলের গন্ধ অনুভব করতাম। এদিক-সেদিক ঘুরে এলেই দেখতাম তার হাতে নানান রঙ-বেরঙের ফুল। এগুলো এনে আমার খোপায় গুজে দিতো।

পৃথিবী বদলে গেছে, বদলে গেছে মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বামীও যেন কেমন হয়ে গেছেন। আগের মতো পাগলের মতো ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ তার মধ্যে দেখি না। ব্যবসার কাজে সব সময় ব্যস্ত থাকেন তিনি। সংসারের চিন্তা, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে ছেলেমানুষি কোথায় যে হারিয়ে গেল।

আর কয়েকদিন পরই ভালোবাসা দিবস। আমাদের সময় এসব ছিল না। এখনকার ছেলেমেয়েরা স্বামী-স্ত্রীরা এদিনটিকে খুব উদযাপন করে। একে অপরকে ফুল দিয়ে তাদের ভালোবাসার কথা জানায়। আমাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম দিনগুলোতে যদি ভালোবাসা দিনটি থাকতো তাহলে সে মনে হয় ফুলে ফুলে ভরিয়ে দিতো আমাকে।

আজকালকার ছেলেমেয়ে, প্রেমিক-প্রেমিকাদের এসব দেখে আমারও হারিয়ে যেতে ইচ্ছা হয় সেই সাতাশ বছর আগের মধুর দিনগুলোতে। খুব ইচ্ছা হয় বিশেষ কোনো দিনে এক গোছা রজনীগন্ধা সে আমার হাতে এনে দিক। স্বামী হিসেবে তার কাছে এ চাওয়া কি খুব বড় কিছু?

লালমাটিয়া, ঢাকা থেকে

বোরখাওয়ালি

– প্রিন্স

এই যে মিস বোরখাওয়ালি, একটু শুনবেন, প্লিজ!

এটা শুনে সে ও তার বান্ধবী দাড়িয়ে হাসের ডিমের মতো চোখ দিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।

রাগত স্বরে সে বললো, আমার কি কোনো নাম নেই নাকি?

সরি, আমি তো আসলে আপনার নাম জানি না। বলেই বললাম, আমি প্রিন্স, আপনি?

তার বান্ধবী তাকে ফিশ ফিশ করে বলছে, দেখতে তো প্রিন্সের মতোই, নামের সঙ্গে চেহারার বেশ মিল আছে। আমি রুনু।

বান্ধবীর দিকে তাকালাম।

আমি ঝুমুর। আপনি মনে হয় নোট করেন, তাই না।

হ্যা, করি তো। আপনার লাগবে নাকি?

না, নোট লাগবে না।

তবে আপনি যে বিভিন্ন বই থেকে নোট করেন সেই বইয়ের রেফারেন্স চাচ্ছি।

নোট–এর কথা বলাতে তার মুখে যে অহংকারের হাসি ফুটে উঠেছিল, নোট লাগবে না বলায় সেই হাসি দপ করে নিভে গেল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখে হাসি টেনে বললো, কালকেই পেয়ে যাবেন।

ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

পরদিন মিস রুনু একগাদা বই ও লেখকের নাম দিল।

নাম দেখে তো ভিমরি খাবার যোগাড়। এতো বই থেকে নোট করা আমার গোবর মার্কা মগজ দিয়ে সম্ভব নয়। তাকে ধন্যবাদ দিলাম।

এরপর থেকে প্রতিদিন তার সঙ্গে কথা হতে লাগলো। আস্তে আস্তে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগলো। ক্লাস শেষ হলে একটা রেস্টুরেন্টে বসতাম। ঘণ্টা খানেক বসে থাকে রিকশায় তুলে দিয়ে বাসায় আসতাম। তার বাসা ছিল চামেলিবাগে।

একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বাসার আশপাশেই অনেক ভালো কলেজ আছে, এতো দূরে ভর্তি হওয়ার কারণ কি?

এর জবাবে যা বললো তা কল্পনাতীত। তোমার মতো একজন বন্ধু পাবো বলেই ভাগ্য আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

বুকের বাম পাশটা চিন চিন করে উঠলো।

একদিন রুনুকে বাসায় নিয়ে এলাম। বাসা বলতে আমি এবং আমার মামা দুই রুমের একটি ফ্ল্যাট নিয়ে থাকতাম।

রুমে ঢুকেই সে হই চই লাগিয়ে দিল। উচু গলায় বলতে লাগলো, এখানে কি মানুষ থাকে, না–গরু ছাগল? ইশ কি একটা ভ্যাপসা গন্ধ!

হেসে বললাম, না তোমার ঘনিষ্ঠজন থাকে।

ফাজলামো হচ্ছে?

না।

তবে রুমে একটি জিনিস গোছানো ছিল। এটা দেখে সে কিছুটা নমনীয় হলো।

তোমার সঙ্গে আমার একটি বিষয়ে মিল আছে।

সেটা কি?

সেটা হলো আমি যেমন পড়ার টেবিল গুছিয়ে রাখি তেমনি তুমিও রাখো। এই বলে সে কোমর বেধে রুম গোছাতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরই রুমটার চেহারা ফিরিয়ে আনলো। এরপরে হালকা নাশতা শেষে খানিক গল্প করে চলে গেল।

সে একটা পারফিউম নিয়ে এসেছিল। তার রেশ এখনো একটু একটু পাওয়া যাচ্ছে। রুমটাকে সে এমনভাবে সাজালো যে, তা দেখে বেশ কিছুক্ষণ তন্ময় ছিলাম। সত্যি, মেয়েটার রুচি বোধ চমৎকার। এই মেয়েটা দিন দিন হৃদয়টাতে যেভাবে জুড়ে বসছে তাতে একে ছাড়া চলবো কিভাবে?

এরপর থেকে সে প্রায়ই বাসায় চলে আসতো। একদিন সকাল আটটায় সে বাসায় হাজির। কারণ, এর আগের দিন বলেছিলাম যে, পরদিন কলেজে আসবো না। তাই সে কলেজে না গিয়ে বাসায় চলে এলো। আমাকে শোয়া অবস্থায় দেখে মেজাজটা চড়ে উঠলো।

সকালবেলা চলে এলাম এখানে। এসে নাশতা করবো বলে। আর তিনি ঘুমোচ্ছেন। বলে রুমটাকে গোছাতে লাগলো।

সে বাসায় যখনই আসতো তখন প্রথমে রুম গোছাতো। এক দৃষ্টে দেখতে লাগলাম। মনে মনে বলতে লাগলাম, রুনু, আমি যে তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি।

সে আমার দিকে তাকালেই ঘুমের ভান করে পড়ে থাকি।

এবার খাটের কাছে এসে ডাকাডাকি শুরু করলো।

এই ওঠো, ওঠো না, যাও হাত-মুখ ধুয়ে এসো। এক সঙ্গে নাশতা করবো।

উঠে বাথরুমের দিকে পা বাড়ালাম।

উফ! কি গরম লাগছে, বলে রুনু বোরখা খুলতে লাগলো। বাথরুম থেকে বের হয়ে মুখ মুছতে মুছতে তার দিকে তাকিয়ে স্ট্যাচু হয়ে গেলাম। সে যে ফর্শা তা তার লাবণ্যে টইটম্বুর মুখশ্রী আর নিটোল হাত দুখানা দেখেই বুঝেছিলাম। কিন্তু এতোটা ফর্শা রঙ তার শরীরে ধারণ করবে তা কল্পনা করিনি। এবং আজ যে পোশাক তার অঙ্গে জড়িয়ে আছে তা সত্যিই মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মতো। নীল শাড়ি, ওই রঙের ম্যাচিং ব্লাউজ, দুই হাত ভর্তি নীল কাচের চুড়ি, কপালে নীল টিপ, পাতলা দুটি ঠোটে গোলাপি রঙের লিপস্টিক হালকাভাবে বোলানো। একজন নীল পরী।

আমার মাথা ঘুরছে।

কেন?

তোমাকে দেখে। এটা বলেই শুয়ে পড়লাম।

একটু পর আধশোয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার? আজ এতো সাজগোজ, কারো সঙ্গে অভিসারে যাওয়া হচ্ছে নাকি?

কি? ইয়ার্কি হচ্ছে, না? বলেই বললো, যার সঙ্গে অভিসারে যাবো ভেবেছিলাম তাকে তো রাজি করাতে পারছি না। আমাকে তার তেমন একটা পছন্দ নয়। এতোক্ষণ হলো রুমে এলাম, অথচ একটি কথাও ভালো করে বলেননি।

খাটে বসা থেকে সে উঠে দাড়িয়ে চললাম বলে এক পা এগোতেই বাম হাত ধরে তাকে দিলাম টান।

ও এসে বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। প্রথমটায় একটু চমকে গেলেও পর মুহূর্তে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরলো যে, আমার বুকটাই যেন এই পৃথিবীতে তার সবচেয়ে নিরাপদ স্থান।

বেশ কিছুক্ষণ জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকার পর বললাম, একটি প্রশ্ন করবো।

কি?

এই যে তুমি আমার জন্য এতো কিছু করছো আর এখন পরম মমতায় জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছো। কোন ভরসায় এবং আমিই বা তোমার কে?

মাথা তুলে গভীর দৃষ্টি দিয়ে মিনিট খানেক চেয়ে থাকার পর বললো, তুমি যে কে তা তুমি বোঝো না?

না, বুঝি না।

আস্তে আস্তে তার নরম পাতলা ঠোঁট দুটি আমার ঠোঁটের সঙ্গে চেপে ধরলো। এবং কিছুক্ষণের জন্য অন্য জগতের বাসিন্দা হয়ে গেলাম। উফ, কি যে সুখ।

যখন দুই জোড়া ঠোঁট আলাদা হলো তখন সে হেসে বললো, এবার নিশ্চয়ই বুঝেছো তুমি আমার কে। আবার জড়িয়ে ধরলো সে।

পরবর্তী প্রত্যেকটা দিন ছিল স্বপ্নের মতো।

একদিন চন্দ্রিমা উদ্যানে হাটছিলাম।

আচ্ছা, তুমি এভাবে আমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ালেখা গোল্লায় দিচ্ছো, এটা তো ঠিক না। তুমি বৃলিয়ান্ট ছাত্রী। ভালো রেজাল্ট করলে ভালো জব পাবে আর চমৎকার একজন স্বামী নামের বডিগার্ড পাবে। আমার মতো ভ্যাগাবন্ডের সঙ্গে ঘুরে নিজের জীবনটাকে নষ্ট করো না।

সঙ্গে সঙ্গে সে মুখোমুখি দাড়িয়ে চোখে চোখ রেখে শীতল দৃষ্টিতে বললো, সেদিনের পর থেকে তুমি আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গেছো। তোমাকে পেলে এ জীবনে আর কিছুই চাওয়ার নেই। এবং না পেলে এ জীবনের সব পূর্ণতাই অপূর্ণ থেকে যাবে। তারপর হঠাৎ আবেগে আপ্লুত হয়ে বললো, আর কোনোদিন যদি তোমার মুখে উল্টোপাল্টা কিছু শুনি তাহলে তোমার একদিন কি আমার একদিন। এরপর তার দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, তোমার কোনো বিশ্বাস নেই। এখন এ মুহূর্তে প্রমিজ করো আর কোনোদিন আমি কষ্ট পাই এমন কথা বলবে না। বিনা কারণে আমাকে দুঃখ দেবে না। কই, হাত রাখো?

আমি হাত না রেখে তার দিকে তাকিয়ে তার চোখের গভীরে পৌছানোর চেষ্টা করলাম। বুঝতে চেষ্টা করলাম তার হৃদয়। লোকে বলে, চোখের ভেতর দিয়ে নাকি হৃদয়ের ভাষা বোঝা যায়। নাহ! যতোটুকু বুঝলাম তার হৃদয়ের সমস্ত অংশটাতেই আমার অবস্থান। তার নরম তুলতুলে হাত দুটি ধরলাম। বললাম, তুমি যা চাও তাই হবে।

আর কিছু বলার আগেই আমি তোমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি বলেই ভীষণ আবেগে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। কান্না ভেজা কণ্ঠে বলতে লাগলো তোমাকে ছাড়া আর কিছুই চাওয়ার নেই। শুধু তোমাকে চাই, আর কিছুই নয়।

ইতিমধ্যে যমুনায় অনেক জল গড়িয়ে গেল। দুজনের পড়ালেখারও ইতি ঘটলো। এর মাঝে তার বিয়ের প্রস্তাব আসতে লাগলো। সে বিভিন্ন অজুহাতে প্রস্তাব উপেক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু বেশি দিন আর উপেক্ষা করতে পারলো না। আমি তখন সদ্য পাস করা বেকার যুবক। আমাদের দেশের চাকরি দেনেওয়ালারা সদ্য পাস করা যুবকদের তাদের প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দিতে বেশি মাত্রায় অপারগ।

একটা মধ্যম মানের চাকরির জন্য খুব চেষ্টা চালালাম। রুনুকে যে আমার চাই-ই চাই। রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে উন্মাদ হওয়ার দশা। রুনু চাচ্ছিল এই অবস্থায় তাকে বিয়ে করে একটা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু সবাই জানেন *দারিদ্র যখন দুয়ারে এসে হানা দেয় ভালোবাসা তখন জানালা দিয়ে পালায়।*

নিজের পায়ে না দাড়িয়ে তোমাকে গ্রহণ করা সম্ভব নয় যখন বললাম তখন আমাকে জড়িয়ে ধরে চোখের জল ফেললো এবং কোনো কথা না বলে চলে গেলো।

এক সপ্তাহ পর সে এলো। ঘরে ঢুকে আমার দিকে তাকিয়ে একটু চমকে উঠলো। হাতে বিয়ের কার্ড। এখানে আসার আগে যে কেদেছে তা গালের ওপর শুকনো জলের ধারা দেখেই বেশ বোঝা যায়। কিন্তু ঘরে ঢুকলো

হাসি মুখ নিয়ে। সাত দিন পর তার বিয়ে। উফ! খোদা এই খবর শোনার আগে তুমি আমাকে তুলে নিলে না কেন।

সে চলে যাবার জন্য পা বাড়ালো এবং ছোট্ট করে বললো, কাপুরুষ।

দাড়াও, গর্জে উঠলাম আমি। বলে কি সে? মাথায় রক্ত উঠে গেছে। এক পা এগিয়ে তার মুখোমুখি দাড়িয়ে বললাম, আমি কাপুরুষ?

হাসি মুখ নিয়ে উত্তর দিল, হ্যা।

ইচ্ছা হচ্ছে তাকে খুন করি। আচমকা তাকে প্রচণ্ড জোরে জড়িয়ে ধরলাম। কাপুরুষ না অন্য কিছু আজকেই তার প্রমাণ হয়ে যাবে।

ঠোটে ঠোট ডুবিয়ে দিলাম। প্রথমে একটু বাধা দিলেও পরে হাল ছেড়ে দেয়। দুই জোড়া ঠোট অবিরাম খেলতে লাগলো। মেয়েমানুষ বলে কথা! কতোক্ষণ আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে। অস্পষ্ট গলায় একটা কথাই শুধু বললো, আমাকে তুমি গ্রহণ করো।

অতঃপর দুজনের গন্তব্য বিছানার ওপর। এরপর হারিয়ে গেলাম পৃথিবীর সবচেয়ে সুখের সন্ধানে রহস্য গুহার অভ্যন্তরে। গুহার অভ্যন্তরে সুখের আস্বাদন শেষে নিজেকে অন্যভাবে আবিষ্কার করলাম।

দুজনে স্বাভাবিক হলাম।

দ্রুত তৈরি হয়ে নিলাম। চলো।

কোথায়?

কাজি অফিসে।

কেন?

বারে, এরই মধ্যে ভুলে গেলে! তুমি তো বললে তোমাকে গ্রহণ করতে। একবার যখন গ্রহণ করেই ফেলেছি তখন কি তাকে ছাড়া যায়।

প্রথমেই আমার চার ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে ফোন করে কাজি অফিসে আসতে বললাম। তাদেরকে নিয়ে শুভ কাজটা সম্পন্ন করে চায়নিজে লাঞ্চ সেরে রুনুকে নিয়ে বাসায় এলাম।

সে আমার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে গেলে দ্রুত তাকে দাড় করিয়ে বললাম, তোমার স্থান ওখানে নয়, এখানে। বলে নিজের বুকের দিকে ইশারা করার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকে ঝাপিয়ে পড়লো।

নীরব, নিস্তব্ধ কোনো কথা নেই।

দুজন দুজনকে পরম আবেশে জড়িয়ে ধরে আছি।

বাসায় যাবে না?

বাসায় তো আছি।

না, মানে তোমার বাবার বাসায়।

বুঝিয়ে-সুজিয়ে অনেক কষ্টে তাকে বাসায় পাঠালাম। সে চলে যাওয়ার পর হাজারও চিন্তা মাথায় কিলবিল করতে লাগলো। কারণ, সে বলে গেছে আগামী এক সপ্তাহের আগে যদি কিছু করতে না পারি তাহলে মরণ ছাড়া উপায় থাকবে না।

চতুর্থ দিন রাতে দুরু দুরু বুকে মামাকে সব খুলে বললাম। সব শুনে চলে যাবার সময় একটা চড় দিলেন। এবং বললেন গাধা।

পরদিন রাতে মামা আমাকে তার অফিসের জুনিয়র অফিসার হিসেবে জয়েন করতে এবং যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে নিয়ে আসতে বললেন।

তার পরদিন তার বাসায় গিয়ে সব খুলে বললাম।

সে যে কি খুশি হয়েছিল তা তার আনন্দ অশ্রু দেখেই বুঝেছিলাম।
যে তার বাবাকে ডেকে আনলো এবং সব খুলে বললো।
আমার শ্বশুর সাহেব তো ভীষণ রাগে ফেটে পড়লেন এবং বললেন, তাকে নিয়ে চলে যেতে চিরদিনের মতো। তিনি আর তার মুখ দেখতে চান না।
সে নীরবে চোখের জল ফেলতে ফেলতে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমার সঙ্গে চলে এলো।
বাসায় এসে দেখি মামা ছোটখাটো আয়োজন করেছেন। অল্প কিছু কাছের আত্মীয়স্বজন উপস্থিত। তারাই তাকে বরণ করে নিলেন।
এক সপ্তাহ পর আমার আব্বা-আম্মা তাদের বাসায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব নিয়ে গেলেন। প্রথমে তারা অনড় অবস্থানে থাকলেও পরবর্তীকালে নমনীয় হতে বাধ্য হন। এই উপলক্ষে বিশাল আয়োজন করা হয়।
এর পরের জীবন ছিল সুখ, হাসি-ঠাট্টা এবং অনাবিল আনন্দে ভরপুর।
আজ দশ বছর পর যখন এই লেখা শেষ করছি তখন আমার অর্ধাঙ্গিনী আমাকে জড়িয়ে শুয়ে আছে। সে জানে যায়যায়দিনের *ভালোবাসা* সংখ্যার জন্য আমাদের প্রেমের কাহিনী লিখছি। কিন্তু কি লিখছি তা জানে না। যখন এই লেখা প্রকাশ হবে এবং পড়ার পর তার চেহারা কেমন হবে সেটা ভেবেই আমার মন পুলকিত হচ্ছে।

ঠিকানা বিহীন

ভালোবাসা মানে

– অর্ণব রাহ্মান

আমি যাকে ভালোবাসি সে পড়ছে চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে। আমি তার কাছ থেকে প্রায় সাড়ে চারশ কিলোমিটার দূরে শাহজালাল ইউনিভার্সিটিতে। তার কাছে আমার ইউনিভার্সিটির ডায়রি আছে। আমারই দেয়া। সেটা দেখে সে অপেক্ষা করে কখন আমার চট্টগ্রাম যাবার সময় হবে। আমিও অপেক্ষা করি কখন একটু বড় সময়ের জন্য ক্লাস ছুটি হবে। আমাদের কাছে তাই ভালোবাসা মানে প্রতীক্ষা।
পূর্ণিমার চাদের মাঝে আমি তার আদল খুজি। তাকে ডাকি পঞ্চদশীর কন্যা। সন্ধ্যা তারার ফাকে সে আমাকে খোজে। আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে। তার কাছে আমি স্বপ্ন দ্রষ্টা। দারুণ বৃষ্টিতে যখন আমার ভিজতে ইচ্ছা হয়, তখন এই এতো দূর থেকেও তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকি। সে সাড়া দেয়। প্রতি বিকেলে ঝোলানো বারান্দায় বসে কফি খেতে খেতে তার সঙ্গে গল্প করার জন্যও আমাকে পাশে চায়। তাই আমাদের কাছে ভালোবাসা মানে স্বপ্ন দেখা।
সে বাসার বড় মেয়ে। তারা পিঠেপিঠি ভাইবোন। তাদের বাবার ইচ্ছা দ্রুত মেয়ের বিয়ে দেয়া। আমি বাসার ছোট ছেলে। সেশন জটের কল্যাণে পড়ালেখা শেষ করবো কবে সেটাই অনিশ্চিত। তারপর আবার নিজের পায়ে দাড়ানোর যুদ্ধ। আমরা দুজনেই দুজনের এ সমস্যাগুলো খুব ভালো করে জানি। তাই দুজনকে এক করে স্বপ্ন রচনা খুব দীর্ঘ করতে পারি না। তাই আমাদের কাছে ভালোবাসা মানে অনিশ্চয়তা।
আমরা যে পরস্পরকে ভালোবাসি এটা কখনোই মুখ ফুটে বলতে হয়নি। কেমন করে যেন আমরা বুঝে গেলাম আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি। যায়যায়দিন পড়ে জানলাম ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস। সেই থেকে ওই দিনটি আমাদের ভালোবাসার বর্ষপূর্তির দিন।
আমাদের দুজনের মধ্যে অনেক মিল আছে, আবার অমিলও আছে। আমরা সেগুলো জানি।

মোটকথা আমরা দুজনে দুজনকে চিনি খুব ভালোভাবে। সে জানে আমার পছন্দের কথা, আমিও জানি সে কি চায়। নিজের মধ্যে তার ইচ্ছার প্রতিফলন করতে, সে চায় আমার মনের মতো হতে। তাই আমাদের কাছে ভালোবাসা মানে শুধু ভালোবাসা।

সিলেট থেকে

ফ্লাওয়ার টাউন

– জাকির

ভালোবাসা দিবস অনেক ঘটনাই মনে করিয়ে দেয়। মনে পড়ে যায় ভালোবাসার সফলতায় ঝলমলে অনেক মুখ। মন ভাঙা অনেক ব্যর্থতার কথা আর আমার নিজের জীবনের অনেক আনন্দ, বেদনা ভরা স্মৃতি। কিন্তু সবচেয়ে বেশি যেটা মনে আসে তা হলো *কোথদংনে* বা ফ্লাওয়ার টাউন–এর কথা।

ফ্লাওয়ার টাউনে প্রথম গিয়েছিলাম ক্যাথলিক সমাজকর্মী গংসুন উ–র সঙ্গে যাকে আমি শান্তিদি বলে ডাকি। প্রথমবার একটা স্বেচ্ছাসেবক ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে যাওয়া। তারপর অনেকবার যাওয়া–আসা। ফ্লাওয়ার টাউন আমার মনে জায়গা করে নিয়েছে সেখানকার ভালোবাসা আর আত্মত্যাগ ভরা মানুষগুলোর জন্য।

শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে এশিয়ার অন্যতম দেশ হলেও সাউথ কোরিয়া এক সময় দরিদ্র দেশের সারিতে ছিল। জাপান–এর শাসন আমলে এখানে প্রচুর দরিদ্র লোক ছিল।

তেমনই একজন চই কই দং যার পেশা ছিল ভিক্ষাবৃত্তি। কিন্তু অন্য দশজন সাধারণ ভিক্ষুকের মতো সাধারণ তিনি ছিলেন না। এই বৃদ্ধের মন ছিল ভালোবাসা আর ত্যাগের মহিমাতে ভরা। সারাটা দিন ভিক্ষা করে যা যোগাড় হতো তা প্রথমেই তুলে দিতেন সেই সব অসহায় মানুষের মুখে যাদের ভিক্ষা করার ন্যূনতম ক্ষমতাও নেই। পঙ্গু, চলৎশক্তিহীন অথবা প্রতিবন্ধী।

পাহাড়ে চই কই দংয়ের একটা ছেড়া তাবু ছিল। সমস্ত দিন ভিক্ষার সময় এমন কোনো অসহায় মানুষের দেখা পেলেই তাকে তুলে এনে আশ্রয় দিতেন তার তাবুতে। সারা দিনের উপার্জন তুলে দিতেন অসহায়দের মুখে। শীতের তুষার, বর্ষার ঢল, সব সময় চাইতেন অসহায়দের আশ্রয় উষ্ণতা দিতে।

এক সময় ধীরে ধীরে তার এই মহৎ কাজের সঙ্গে একাত্ম হলেন সমাজের কিছু মহৎ মানুষ। সবার ভালোবাসা আর প্রচেষ্টায় বেড়ে উঠলো সেই তাবুর পরিসর। তাবুর স্থানে বিল্ডিং উঠলো। দুর্গম পাহাড়ের মধ্য গড়ে উঠলো ফ্লাওয়ার টাউন, বৃদ্ধ চই কই দংয়ের স্বপ্নের ফ্লাওয়ার টাউন।

বৃদ্ধ এখন আর নেই। কিন্তু তার মহৎকর্মের ভার কাধে তুলে নিয়েছে অসংখ্য মহৎ মানুষ। পাহাড় ঘেরা আটটি বৃহৎ ভবন এবং তার দুই হাজার কর্মী প্রতিনিয়ত সেবা ও ভালোবাসা দিয়ে চলেছে ছয় হাজারেরও বেশি দুঃস্থ মানুষকে। ফ্লাওয়ার টাউনে রয়েছে ঠিকানাহীন বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধী পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য আলাদা বাসস্থান এবং হাসপাতাল। প্রতিদিন খাদ্য ও চিকিৎসা এবং অন্যান্য খাতে খরচ হয় পনেরো থেকে আঠারোশ লাখ টাকা যার পঞ্চাশ ভাগ আসে সরকার থেকে এবং বাকিটা সাধারণ মানুষের দান।

ফ্লাওয়ার টাউনে ঢোকার মুখে দাড়িয়ে আছে বৃদ্ধ চই কই দংয়ের মূর্তি। তার পেছনে একটা ফলকে লেখা আছে, *তুমি যদি দুটি টাকা ভিক্ষা পাও, একটি টাকা দিও তাকে যার ভিক্ষার ক্ষমতাও নেই।*

আমি আর শান্তিদি ছুটি পেলেই চলে যাই ফ্লাওয়ার টাউনে। কখনো ওল্ড হোমে সময় কাটাই বৃদ্ধা–বৃদ্ধদের সঙ্গে। কখনো প্রতিবন্ধীদের ধোয়া কাপড়গুলো গুছিয়ে দিই, ঘর গুছিয়ে দিই। কখনো শিশুদের মুখে তুলে খাবার খাইয়ে দিই। অঙ্গভঙ্গি করে তাদের মুখর করে তুলি। হাসিতে ভরে যায় তাদের কান্না ভেজা মুখগুলো।

ফেরার সময় যখন পেছন থেকে হাত টেনে ধরে তখন তাদের দিকে তাকাতে পারি না। শুধু আমরা দুজনই নই, ছুটির দিনে অসংখ্য মানুষ আসে এখানে তাদের ভালোবাসার ভাগ দিতে এই অসহায় পরিত্যক্ত মানুষের।

এবারের ভালোবাসা দিবস এবং ঈদুল আযহা প্রায় একই সময়ে আসছে। ঈদুল আযহা ত্যাগের প্রতীক, আনন্দের দিন আর ভালোবাসা দিবস হৃদয়ে হৃদয়ে বাধার দিন। তার এক সপ্তাহ পরই একুশে ফেব্রুয়ারি। ভাষার জন্য ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের মহান দিন। সারা ফেব্রুয়ারি মাসটাই যেন ভালোবাসা এবং আত্মত্যাগে ভরা।

আমাদের চারপাশে রয়েছে অসংখ্য অসহায় মানুষ যাদের কাছে ঈদ মানে সন্তানের মুখে হাসি ফোটাতে না পারার কষ্ট। রয়েছে সেসব শিশুর দল যারা জন্মেই আশ্রয় পেয়েছে আবর্জনায়। প্লিজ, আসুন না আমরা ভালোবাসার হাত বাড়াই। একটু ত্যাগের বিনিময়ে একটু কি হাসি ফোটানো যায় না ওদের মুখে? আমরা কি পারি না আমাদের চারপাশ ফুলে ফুলে ভরে তুলতে? এক একটা ফ্লাওয়ার টাউন গড়ে তুলতে? হোক না অতি ক্ষুদ্র, ক্ষতি কি?

সাউথ কোরিয়া থেকে
sufi77bd@yahoo.com

বিসর্জন

– আকাশ

মিতু ছিল আমার চাচাতো বোনের বান্ধবী। সেই সূত্রে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। তাছাড়া মিতু, আমি ও আমার চাচাতো বোন একই সঙ্গে পড়তাম। এছাড়া সে আমার সম্পর্কে খালাতো বোন ছিল। সেই সূত্র ধরে তার বাড়িতে আসা-যাওয়া করতাম। তার বাবা মায়ের কোনো ছেলে সন্তান ছিল না। তাই তারা আমাকে ছেলের মতোই দেখতেন।

তার এবং আমার বাড়ি কাছাকাছি হওয়ায় অধিকাংশ সময় তার বাড়িতে কাটাতাম। এই আসা-যাওয়ার মাধ্যমে তার সঙ্গে আমার ভালো বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এভাবে চলতে থাকে বেশ কিছুদিন। এক পর্যায়ে দুজন দুজনকে পছন্দ করে ফেলি। কিন্তু কেউ কথাটি আগে বলতে পারিনি।

অবশেষে সে একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করাতে বলে ফেলি।

তারপর থেকে আমাদের ভালোবাসা চলতে থাকে। অতঃপর এলো ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস। গেলাম তাকে শুভেচ্ছা জানাতে। তাকে আদর করতে খুব ইচ্ছা করছিল। তাই তাকে বললাম আমার ইচ্ছার কথা।

সে আমাকে নিরাশ করলো না।

তাকে জড়িয়ে ধরলাম। তারপর আদর করে মিষ্টি একটা চুমু দিলাম তার নরম ঠোটে।

সেও আমাকে দিল।

এভাবে চললো কিছুক্ষণ। এতে আমার শরীরে এক শিহরণ জাগলো। কারণ, এই প্রথম কোনো মেয়েকে আদর করা। এরপর দেখি সেও লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছে।

এভাবেই আমাদের আনন্দময় জীবন চলছিল। এরপর এলো সেই বাধ ভাঙা ঢেউ যা আমার জীবনকে তছনছ করে দিল।

মিতুর বাবা মা তার বিয়ে ঠিক করে ফেললো। তখন সে আমাকে বললো বিয়ে করতে। কিন্তু আমার পক্ষে তা তখন সম্ভবপর ছিল না। কারণ, আমি তখন সবেমাত্র এইচএসসি পরীক্ষার্থী। তাছাড়া এটা পারিবারিকভাবে, সম্ভব ছিল না।

তার বাবা-মা ও আমাদের পরিবারের কেউ আমাদের সম্পর্কের কথা জানতো না। তারা আমাকে খুব ভালোবাসতেন।

তার বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল। এবং তার বিয়েতে আমাকে থাকতেই হলো আর সেখানে থেকে আমার কিছু কাজ করতে হলো যেগুলো না করলেই নয় এমন অবস্থা। তাই যতোই কষ্ট হোক না কেন আমাকে সেখানে থাকতে হলো।

নির্দিষ্ট সময়ে বরযাত্রী এলো। বরকে সংবর্ধনা জানিয়ে আমি নিয়ে গেলাম। তাদেরকে খাওয়ালাম। অবশেষে যখন বিয়ে পড়ানো শুরু হলো তখনো সেখানেই ছিলাম। হয়তো বা সে কারণেই সে কিছুতেই কবুল বলতে পারছিল না, কান্নায় ভেঙে পড়ছিল।

এ অবস্থা দেখে আমার এক বন্ধু সেখান থেকে আমাকে নিয়ে আসে। এভাবে আমার ভালোবাসার করুণ পরিসমাপ্তি ঘটে।

আমার ভালোবাসাকে সেদিন আমি ধরে রাখতে পারিনি। কারণ, সেদিন আমি স্বাবলম্বী ছিলাম না এবং কিছু করতে পারিনি পরিবার ও সমাজের জন্য।

জুনিয়াদহ, কুষ্টিয়া থেকে

আদর্শ

– এম মনসুর আলী মেমোসা

আমার বাবাকে দেখিনি। তাই তার কোনো স্মৃতি আমাতে নেই। কিন্তু বাবা না থাকার কষ্ট আমি বুঝেছি। বাবা মারা যাওয়ায় আমার শৈশব কেটেছে দারিদ্রের টানাপোড়েনে, আত্মীয়স্বজনদের দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর। স্কুলে পড়ার সময় বেতন দিতে পারতাম না। এক মাসের বেতন তিন মাসে দিতাম। স্কুলে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মিশতে পারতাম না আমার দারিদ্রের কারণে।

স্কুলে শিক্ষা সফর কিংবা বনভোজনে যেতে পারিনি কখনো টাকার অভাবে। বন্ধুরা যেতো কেননা তাদের বাবা আছে আর তাদের বাবার আছে অনেক টাকা। ক্লাস রুমে তাদের গল্প শুনে আমার কেটে যেতো দিন। বন্ধুদের মধ্যে যাদের বাবা বিদেশে থাকে ওরা শোনাতো তাদের বাবার পাঠানো কাপড়-চোপড় এবং উপহারের গল্প। শোনাতো টেলিফোনে বাবার সঙ্গে কথা বলার অনুভূতি। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতাম। সেসব দিনগুলো এখনো চোখে ভাসে।

এখন একটা ফার্মে চাকরি করি। হাতে অনেক টাকা। কিন্তু ইচ্ছে করলেও সেসব দিনে ফিরে যেতে পারি না যেখানে আমার টাকার দরকার ছিল। ইচ্ছে করলেই ফিরে যেতে পারি না সেই অতীতে, সহপাঠীদের আড্ডায়। তাদের বলতে পারি না, আমার পিকনিকে ভ্রমণের গল্প কিংবা নতুন কেনা কোনো শার্ট অথবা মোবাইলের গল্প।

এখন আমার মা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবরা তাগাদা দিচ্ছে বিয়ে করার জন্য। কিন্তু আমি রাজি হচ্ছি না। কারণ, আমার প্রচুর টাকার দরকার। চাই অনেক বড় ব্যাংক ব্যালান্স। আমি চাই না, আমার অকালমৃত্যুতে আমার সন্তানরা টাকার অভাব অনুভব করুক, স্কুলের বেতন নিয়ে কষ্ট পাক। পিকনিক যাওয়া নিয়ে মনঃক্ষুণ্ন হোক। পছন্দের পোশাক কিনতে না পেরে আড়ালে চোখের পানি ফেলুক। আমার বাবার অকালমৃত্যু যেমন আমার কষ্ট, অভাব ও শখ পূরণের বাধা হয়েছিল তেমনি আমি চাই না, আমার অকালে অস্বাভাবিক মৃত্যু আমার সন্তানদেরও একই পরিণতির দিকে নিয়ে যাক।

তাই ভালোবাসা দিবসে আমার অনুরোধ, একজন আদর্শ বাবা হওয়ার আগে ব্যাংকে আপনার সন্তানদের জন্য টাকার পাহাড় গড়ুন। বাবা হওয়া কোনো গর্বের ব্যাপার নয়। ছেলেমেয়েদের চাহিদা এবং স্বাধ পূরণেই একজন আদর্শ বাবার গর্ব।

চট্টগ্রাম থেকে

ব্লু পাসপোর্ট

রিকৃয়েশন ছুটি নিয়ে গ্রামের বাড়ি বরিশালে যাচ্ছিলাম। যথাসময়ে গিয়ে লঞ্চের ক্যাবিনে ঢুকতেই চোখ ছানাবড়া। ক্যাবিনের সামনের বারান্দায় অত্যন্ত অলস ভঙ্গিতে বসে আছে একটি মেয়ে। বয়স আনুমানিক ষোল থেকে আঠারো। উচ্চতা মাঝারি, চুলগুলো লাল টাইপের এবং কোকড়ানো। শরীরে ওড়না জাতীয় কাপড়ের কোনো বালাই নেই। কানে সিডি ওয়াকম্যান তোলা। কেমন একটা ড্যামকেয়ার ভাব।

মনে মনে মেয়েটিকে গালি দিলাম। সঙ্গে অত্যন্ত বয়স্ক লোকটিকে দেখে ভাবলাম কোনো উচ্চবিত্তের উচ্ছৃঙ্খল মেয়ে তার দাদা অথবা নানার সঙ্গে গ্রামের বাড়ি যাচ্ছে আনন্দ ভ্রমণে।

ইতিমধ্যে আমাদের জলযানটি বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা পার হয়ে মেঘনার বুকে মাথা দিয়েছে।

লঞ্চে গল্প করে সময় পার করার মতো কাউকে খুজে পাচ্ছিলাম না। মেয়েটি ততোক্ষণে অন্য এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে। বাধ্য হয়ে তাদের কথাগুলো ওভারহিয়ার করছিলাম। শুনলাম মেয়েটি নিউ ইয়র্ক, ফ্রাংকফুর্ট, হিথরো আর দুবাই–এর গল্প করছে।

আমি আবার চিন্তা করলাম, হয়তো বা এয়ারহস্টেস হবে।

একটু পরে সাহস করে গিয়ে বললাম, ম্যাডাম, কিছু মনে করবেন না, আমি কি একটি ম্যাগাজিন পেতে পারি সময় কিল করার জন্য?

এখানে উল্লেখ্য যে, সদরঘাটের হকারদের কাছে কেউ চাইলেও প্রিয় ম্যাগাজিন যাযাদি পাবে না। সেখানে অধিকাংশই পিনআপ পর্ণো ম্যাগাজিন।

উত্তরে মেয়েটি বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বললো, সরি। আমি ছোট সময় থেকেই আমেরিকাতে বসবাস করছি বলে বাংলা তেমন পড়তে পারি না। আপনি চাইলে আমার সঙ্গে বসে গল্প করতে পারেন।

এ যেন মেঘ না চাইতেই জল। আমরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হলাম।

তার নাম রূপা। থাকে আমেরিকার ফ্লোরিডা–য়। বাবা মায়ের সবচেয়ে ছোট এবং আদরের। বড় ভাই আমেরিকান নাগরিক। ছোট ভাইটি সুইটজারল্যান্ডে হোটেল ব্যবস্থাপনায় পড়ছে। সঙ্গের বয়স্ক লোকটি নাকি তার বাবা।

মজা করার জন্য বললাম, আমার অনুমান ছিল লোকটি তোমার দাদা অথবা নানা।

উত্তরে রূপা বললো, আমার বাবার সঙ্গে মায়ের প্রায় ত্রিশ বছরের ব্যবধান।

এদিকে লঞ্চটি শীতলক্ষ্যা অতিক্রম করে যতোই চাদপুরের দিকে এগোচ্ছিল ততোই আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃসহ স্মৃতিগুলো মনটাকে ক্ষতবিক্ষত করছিল। চোখের কোণে পানি জমছিল।

রূপা আমার ফ্যামিলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো।

কষ্টের সঙ্গে বললাম, আমার আর কেউ নেই।

সে বিশ্বাস করতে চাইলো না।

বললাম, জানো, এই লঞ্চ এবং নদীর সঙ্গেই আমার জীবনের সবচেয়ে ট্র্যাজিক স্মৃতিগুলো জড়িত। আমি ব্রোকেন ফ্যামিলির বড় ছেলে। একটা আমেরিকান প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি। বাবা–মায়ের যৌথ উত্তেজনার ফসল আমরা ছিলাম দুই ভাইবোন। আমার ভাষার জন্য দুঃখিত।

জন্ম দেয়ার পর আমাদের প্রতি তারা কোনো দায়িত্ব–কর্তব্য করেননি। তারা এখনো বেচে আছেন কিন্তু বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করছেন। আর্থিক দৈন্যতার ভেতর দিয়ে বোনটাকে লেখাপড়া শিখিয়ে বিয়ে দিয়েছিলাম। তার একটা সুন্দর পুত্র সন্তান হয়েছিল। আদর করে নাম রেখেছিলাম অর্ক। কারণ, তার মায়ের নাম ছিল অনামিকা। তবে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস অনামিকার অর্ক আকাশে আলো বিতরণের আগেই রাহুর করাল গ্রাসে ঢাকা পড়ে গেছে চিরতরে।

২০০২ সালের ৩ মে ঠিক এই ষাটনল জায়গাটিতেই *সালাউদ্দিন–২* নামে লঞ্চটি ঝড়ের কবলে পড়ে মেঘনার অতল গহ্বরে তলিয়ে যায়। পরবর্তীকালে অনামিকা এবং অর্ককে এখানেই এক বন্ধুর বাড়িতে সমাহিত করা হয়।

উল্লেখ্য যে, আমার বাবা ছিলেন কারমাইকেল কলেজ থেকে পাস করা ইংরেজির একজন নামকরা শিক্ষক। তিনি খুব সুন্দর করে ছাত্রছাত্রীদের পড়াতেন। কিন্তু মেঘনার বুকে তার অনামিকা হারিয়ে যাওয়ার পর তিনি আর *ডি নদীর বালুচর* কবিতাটি পড়াননি।

আমার কথাগুলো শোনার পর রূপা বললো, ডোন্ট ওয়ারি। আমরা একই মেরুর বাসিন্দা।

বললাম, তোমার তো অভিযোগ থাকার কথা নয়। কারণ, তুমি পৃথিবীর সমৃদ্ধ একটি দেশের নাগরিক।

রূপা বললো, তোমার ধারণা, তুমিই পৃথিবীর সব চেয়ে দুঃখী মানুষ। প্রত্যেকটা মানুষের কিছুটা দুঃখ বোধ থাকে। সে নিজের কথা শুরু করলো।

রূপা বিত্তবান ঘরের মেয়ে। মামার একান্ত ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে আমেরিকায় চলে যায় পড়াশোনা করার জন্য। তখন তার বয়স বারো। কিন্তু নির্মম বাস্তবতার কাছে সে পরাজিত হয়। মামার সদিচ্ছা থাকলেও মামির বৈরী আচরণের কারণে রূপাকে 'ও' লেভেল পাস করার আগেই বাংলাদেশি এক অবৈধ ইমিগ্রান্টের কাছে বিয়ে দেয়া হয়।

রূপার বর্ণনা মতে, তার স্বামী ছিল অলস, দুশ্চরিত্র, মাতাল এবং দেখতে আদনান সামি–র মতো। প্রায়ই তাকে শারীরিক নির্যাতন করতো। কপালের ওপর একটা কাটা দাগ দেখিয়ে বললো, মদের বোতলের আঘাতের চিহ্ন। এ জন্য অবশ্য স্বামীকে কয়েকদিন শ্রীঘরে থাকতে হয়েছিল।

ইতিমধ্যে রূপা ও বাবুর কামনার ফসল হিসেবে জন্ম হয় শিশু কন্যা পার্ল–এর। পার্লের জন্মের পর পরই রূপার ওপর অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়তে থাকে। রূপা ঘণ্টায় সাত ডলারের কাজ করে তার সংসার চালায়। তার কিছুদিন পর পার্ল–কে নিয়ে বাবু ঢাকা চলে আসে।

শুরু হয় রূপার জীবনে চরম একাকীত্ব। রাগে, দুঃখে বড় ভাই ও মামার সঙ্গে রূপা সম্পর্ক ছেড়ে দেয়। রূপার জীবনে শুরু হয় আরেক অধ্যায়।

রূপচাদ ভানিয়া নামের এক পাকিস্তানি আমেরিকান তাকে তার প্রতিষ্ঠানে কাজ দেয়। বিনিময়ে ডলার, পাউন্ডের মোহ দেখিয়ে তাকে বিয়ে করতে চায়। ছেলেটি ভালো ম্যানারের। কিন্তু অন্য কমিউনিটির এবং ভিকি নামের একটা হিস্পানিক মেয়ের সঙ্গে তার আট বছরের লিভ টুগেদার চলছে। ফসল হিসেবে রয়েছে একটা আন ওয়ানটেড বেবি।

মনে মনে ভাবলাম, হায়রে আমেরিকা... , হায়রে জীবন...!

রূপার একটা মেজর টনসিল অপারেশন হয়। ভ্যাকেশনের জন্য ঢাকায় আসে দশ বছর পর। কথা প্রসঙ্গে বললো, তার এক কাজিন ওকে বিয়ে করতে চায়। ওকে বিয়ে করে আমেরিকায় যেতে চায়।

বললাম, ভেরি গুড, তোমার কাজিন যেহেতু, ভালোই হবে।

সে বললো, ছেলেটি নাকি হাই, হ্যালো পর্যন্ত বলতে পারে না। গ্রামের কলেজ থেকে নকল করে বিএ পাস করেছে। তাছাড়া সে আমাকে ভালোবাসে না। সে ভালোবাসে আমেরিকান ব্লু পাসপোর্ট।

খুব করে বোঝালাম, ছেলেটি তোমার কাজিন। তাছাড়া তার মা নেই, বেকার বলে সচ্ছল জীবনের আশায় তোমাকে অবলম্বন করে আমেরিকায় যেতে চাইছে। নিশ্চয়ই সে তোমাকে ভালোবাসে। তাছাড়া তোমার মা যেহেতু চাইছেন, সুতরাং তোমার আপত্তি থাকার কথা নয়।

সে বললো, জীবনটা আমার। সুতরাং সিদ্ধান্তটা আমাকেই নিতে হবে। বাবা-মায়ের মন রক্ষা করতে গিয়ে নিজেকে আরেকবার কোরবানি দিতে পারি না।

এভাবে গল্প করতে করতে ভোর পাচটা যখন হলো তখন লঞ্চ পটুয়াখালি টার্মিনালে ভিড়লো।

বাড়ি থেকে ফেরার পথে রূপার ফ্যামিলির সঙ্গে পরিচিত হই। তারপর ঢাকা এসে মাঝে মধ্যে ফোনে কথা হয়। মাঝখানে রূপা ঢাকায় আসে ফ্লাইট শেডিউল বদলানোর জন্য। তখন তার সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হই।

১৭ সেপ্টেম্বর রূপার ফ্লাইট। ১৫ তারিখে তার বাবা-মাসহ ঢাকায় এসে একটা হোটেলে ওঠে।

১৬ তারিখ সকালে ফোনে গুডমর্নিং জানাতেই সে বললো, ভাই, ভেরি ব্যাডমর্নিং এবং ফোনটা তার মায়ের কাছে দিলো কথা বলার জন্য।

তার মা আমাকে অনুরোধ করলেন দেখা করার জন্য।

হোটেলে গিয়ে শুনি তার কাজিন ফ্লাইটের টিকেট, পাসপোর্ট, সোশাল সিকিউরিটি কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, কিছু ক্যাশ ডলার এবং অর্নামেন্টসহ রূপার ব্যাগটি নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। তারপর ফোন করে রীতিমতো হুমকি দিচ্ছে, আজ দিনের মধ্যে তাকে বিয়ে না করলে কিছুই ফেরত দেবে না।

আমি থানায় জিডি করতে বললে রূপা বললো, তাহলে তার দীর্ঘ মেয়াদী পানিশমেন্ট হবে। বাংলাদেশি ছেলেরা এ রকম লোভী কেন ব্লু পাসপোর্টের জন্য?

উত্তরে বললাম, ছেলেরা বলে সবাইকে দোষী করো না। তোমার কাজিন দোষী।

পরবর্তীকালে রূপা অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলো কবুল বলে পেপারসগুলো ফেরত পাবার জন্য।

কথা ছিল কবুল বললেই কাগজগুলো ফেরত দেবে এবং রূপা আমেরিকা গিয়ে নতুন করে তার জন্য পেপারস তৈরি করবে। কিন্তু বিধি বাম।

১৬ সেপ্টেম্বর রূপার জীবনে আরেকটি অন্ধকার রাত নেমে আসে। কবুল বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার কাজিনটি স্বামিত্বের অধিকার আদায়ে মরিয়া হয়ে ওঠে। অথচ রূপার সঙ্গে বাবুর তখনো আইনত ছাড়াছাড়ি হয়নি।

রূপার জীবনের ওই রাতটিকে আমি বাসর রাত, নাকি... কামুক নরপিশাচের মর্ষণকামিতা বলবো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। সব ঘটনা শুনে নির্বাক হয়ে গেলাম।

রূপা ১৭ তারিখে আমেরিকা যাওয়ার বদলে পটুয়াখালি চলে গেল। একদিন ফোনে বলেছিল সে যদি পালিয়ে আমার কাছে আসে তাহলে আমি তাকে আমেরিকান এমবাসি-তে পৌছে দিতে পারবো কি না। সামাজিকতার কথা চিন্তা করে এড়িয়ে গিয়েছিলাম। পরে ফোন করলে রূপার কান্নাজড়িত কণ্ঠ ছাড়া কিছুই বুঝতে পারিনি।

অবাক লাগে, মানুষের নৈতিকতা এতো নীচু হয় কি করে! সামান্য পাসপোর্টের জন্য অন্যের বৌকে জোর করে তার ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায় কি করে? এখন দেখি রূপার কথাই সত্যি যে, তার কাজিন পাসপোর্টটিকে ভালোবেসেছিল, রূপাকে নয়।

রূপাকে সৎ বন্ধু হিসেবে উপদেশ দিয়েছিলাম যে, বাবুর সঙ্গে মিটমাট করার জন্য।

কিন্তু সে বললো, যে স্বামী আমার সামনে অন্য আরেকটি মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তার সঙ্গে কিভাবে এক সঙ্গে থাকা যায়?

ওদিকে রূপচাদভানিয়া-র হ্যাংওভার এখনো কাটেনি। তার বাবা-মা রূপাকে পছন্দ করতেন। রূপাও সেটা জানে।

রূপা আমাকে বললো, আমি তোমার মতো একটা সৎ ছেলের সঙ্গে আমার এই নোংরা জীবনটাকে জড়াতে চাই না, বরং তুমিই আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং ভালো বন্ধু হিসেবে থাকো।

অবাক হচ্ছি ভালোবাসার প্রকাশ ভঙ্গি দেখে। রূপার সঙ্গে অবৈধ বাবু ভালোবাসার ভান করেছিল। আমেরিকায় স্থায়ী হওয়ার জন্য রূপাকে ডলারের লোভ দেখিয়ে ভানিয়া ভালোবাসতে চেয়েছিল দৈহিকভাবে ভোগ করার জন্য। আর তার কাজিন জোরপূর্বক কবুল নামে প্রহসন করেছিল স্রেফ রূপার নাগরিকত্ব পুজি করে আমেরিকায় যাওয়ার জন্য।

রূপাকে আমি ভালোবাসি একজন প্রকৃত বন্ধু হিসেবে।

হ্যাপি ভ্যালেনটাইনস ডে টু রূপা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা থেকে
kamu_@yahoo.com

শিকার

পায়ে কিসের যেন স্পর্শ পেয়ে চমকে ওঠে জয়। সাপ না তো! ভয় পেয়ে দাড়িয়ে পড়তে চায় সে। এমন সময় ইশিতার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় মিটিমিটি হাসছে সে।

জয় বুঝতে পারে তার এই নতুন ছাত্রীটি বেশ সাহসী। জয় ভাবতে থাকে তার সাহসী ছাত্রীর এই খেলায় কোন ভূমিকা নেবে সে - রক্ষণাত্মক, না আক্রমণাত্মক? পুচকে ছাত্রীর কাছে হেরে যাবার ছেলে নয় জয়। কাজেই জয় সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল আক্রমণ ভাগেই খেলবে সে। ফলে পায়ে পায়ে বেশ কিছুদিন জমলো খেলা।

একদিন সুযোগ পেয়ে ইশিতার গালে টুক করে একটি চুমু দিয়ে দিল জয়।

আরেক গাল বাড়িয়ে দিয়ে ইশিতা জিজ্ঞাসা করলো, এই গালের দোষ কি?

বই, খাতা, কলম পরে থাকে টেবিলের ওপর অবহেলায়। তাদের হাত-পা আর চোখের খেলা চলতে থাকে। জয় ভাবতে থাকে কিভাবে বিছানায় নেয়া যায় ইশিতাকে।

ইতিমধ্যে ইশিতার শরীরের মাপ নেয়া হয়ে গেছে। তাই তার মনে হচ্ছে ইশিতা আপত্তি করবে না। তবে যদি সে রাজি না হয় তাহলে কৌশলে কার্যসিদ্ধি করতে হবে।

একদিন সুযোগ বুঝে ইশিতাকে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব দিল জয়। ইশিতা যেন এমন প্রস্তাবের অপেক্ষাতেই ছিল। সানন্দে রাজি হয়ে গেল সে। জয় ঠিক করলো ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে নিয়ে আসবে ইশিতাকে।

আবাসিক হলে সিট না পেয়ে ক্যাম্পাসের কাছেই একটি কটেজে সিট ভাড়া নিয়ে থাকে জয়। তার রুমমেট ঘনিষ্ঠ বন্ধু পারভেজ। পারভেজকে বিস্তারিত জানিয়ে জয় অনুরোধ করলো, ইশিতা এলে পারভেজ যেন তাদের কিছুক্ষণ নিরিবিলি থাকতে দেয়।

পারভেজ জয়কে অভয় দিয়ে তার লকার থেকে একটি ছোট ক্যামেরা বের করে আনলো। জয়ের হাতে ক্যামেরাটি দিয়ে পারভেজ বললো, এটা ব্যবহার করবে তো?

এটা ছাড়া তো আমার উদ্দেশ্য সফল হবে না বন্ধু। উত্তরে বললো জয়।

নাম-ঠিকানা বিহীন
ferrywala13@yahoo.com